[illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

| শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ।

॥ পাঁচ টাকা ॥

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩] শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অনেকে ধ্যান ও কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব ভক্তির আতিশয্য দিয়া পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। এই সকল রচনার সাহায্যে তিনি আসল মানুষটি কেমন ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা সেই আসল মানুষটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি,—কল্পনার দ্বারা নয়, ভক্তির দ্বারা নয়, সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা। আমাদের এই বইখানি ডকুমেণ্টারি ইতিহাস, উপন্যাস বা ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী নয়। এই ইতিহাসের আরম্ভ ১৮৭৫ সনের ২৮এ মার্চ কেশবচন্দ্র-পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত সংবাদ হইতে। ইহার পূর্ব্বে পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোনও লিখিত বা মুদ্রিত উল্লেখ পাই নাই। এই ইতিহাসের জের দীর্ঘকাল চলিয়াছে, আজিও অন্ততঃ একজন জীবিত আছেন যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কথা হয়ত এখনও শেষ করেন নাই; তিনি বিবেকানন্দ-সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত—মহিম। চোখে দেখিলেও তাঁহার বক্তব্যের তিনি নাম দিয়াছেন "অনুধ্যান"। তিনি ভক্ত না হইয়া লেখক হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিতে পারিতেন।

১৮৭৫ সনের ১৫ই মার্চ তখনই-জগদ্‌বিখ্যাত কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সেই দিন হইতে তিনি ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলী দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নানা ভাবে প্রচার করিতে থাকেন। ফলে দলে দলে সেকালের শিক্ষিত যুবকেরা সাধুদর্শনে যাইতে থাকেন; ইঁহাদের

অধিকাংশই কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পরমহংস-দেবের প্রভাব প্রবলতর হওয়াতে ইঁহাদের অনেকে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের অধিকাংশই এই দল-ত্যাগীদের দলে।

দলাদলির এইখানেই সূত্রপাত, কিন্তু উদারহৃদয় ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন তাহা প্রকাশ পায় নাই। ১৮৮৪ সনেই ৮ই জানুয়ারি কেশব দেহরক্ষা করেন। পরমহংসদেবের তিরোভাব ঘটে আড়াই বৎসর পরে—১৮৮৬ সনের ১৬ই আগষ্ট, কাহার উপর কাহার প্রভাব, অর্থাৎ কে গুরু আর কে শিষ্য ইহা লইয়া সাময়িক-পত্রে একটু একটু করিয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর পরে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আচার্য্য ম্যাক্সমুলার *Nineteenth Century* পত্রিকায় "A Real Mahatman" প্রবন্ধ লিখিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই কলহের ইন্ধন যোগান; তিনি কেশবচন্দ্রকে পরম-হংসদেবের শিষ্য বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার পরেই কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়, সে কাদা পরমহংসদেব ও কেশবচন্দ্রের গায়েও লাগে। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে ১৯২৮ সনে পরমহংসদেবের জীবনী লিখিতে গিয়া ভূমিকায় মনস্বী রমাঁ রলাঁ এই কুৎসিত বিবাদের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ

> At this distance from their differences I refuse to see the dust of battle; at this distance the hedges between the fields melt into an immense expanse. I can only see the single river, a majestic *"chemin qui marche"* (road which marches) in the words of our Pascal. And it is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived, but realised in himself the total Unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given him my love; and I have drawn a little of his sacred water to slake the great thirst of the world.

আমাদেরও সেই কথা। কলহের ধূলি দেখিতে আমরাও প্রস্তুত নই, যদিও পরমাশ্চর্য্যের কথা এই যে, রলাঁর পুস্তক প্রকাশের পর

ভূমিকা

আবার দ্বিতীয় বার এই কলহের ধূলি উড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে দলগত (সাম্প্রদায়িকও বলা চলে) ভ্রান্তি অথবা মোহের বশে পরমহংসদেবকে কেহ বা স্বয়ং ভগবান্‌রূপে, আবার কেহ বা একজন ব্যাধিজরাগ্রস্ত সাধারণ মানুষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের বহু আয়াস ও যত্নলব্ধ অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় অসাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁহার প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যে-কেহ জিজ্ঞাসু ও তাপিত চিত্ত লইয়া তাঁহার কাছে গিয়াছেন তিনিই পরিতৃপ্ত ও শীতল হইয়া ফিরিয়াছেন; কোনও ধর্ম্মমতই তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না, কোনও মানুষই তাঁহার নিকট অপাংক্তেয় ছিল না, ভগবদ্‌প্রসঙ্গ ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার সংস্পর্শে যে-কেহ আসিত তাহারই মনে এই দিব্য অনুরাগের স্পর্শ লাগিত; তাঁহার প্রাত্যহিক কথাবর্ত্তার মধ্যে অতি সাধারণ উক্তি ও উপদেশগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী হইতে অতি নগণ্য মানুষকেও বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিত। তাঁহার তিরোভাবের পরে প্রকাশিত কথামৃতকে অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যে-উক্তিগুলি, জীবিতকালে অথবা দেহরক্ষার অব্যবহিত পরে সাময়িক-পত্রে অথবা পুস্তিকাকারে বিধৃত হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রথম দিকের যাবতীয় উক্তি স্বয়ং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই উক্তি-গুলির প্রত্যেকটি আমাদের গ্রন্থমধ্যে অথবা পরিশিষ্টে প্রকাশ করিয়াছি। একমাত্র কেশবচন্দ্র-প্রকাশিত উক্তি-সংগ্রহের পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিতে না পারায় আমাদের সমসাময়িক উক্তিসংগ্রহ কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হইয়াছে। তবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, অধুনা (পঞ্চম সংস্করণ ১৩৫৬ সাল) নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটি কর্ত্তৃক ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের নামে প্রচারিত 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন' পুস্তকে প্রথম ১১৪টির মধ্যেই কেশব-সংগৃহীত উক্তিগুলির প্রত্যেকটিই আছে; পুস্তকটি চালু থাকার দরুণ আমরা সেগুলি পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম না। এই সকল সহজ সাদাসিধা unvarnished উক্তির মধ্যেই পরমহংসদেবের

মাহাত্ম্য যে-কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাময়িক-পত্রের সংবাদগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনীও মোটামুটিভাবে পাওয়া যাইবে। এই সকল বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীরা দিয়াছেন, এবং ভিন্নধর্ম্মমত-পোষণকারীরা দিয়াছেন, ইহাই এগুলির সত্যতার প্রমাণ।

পরমহংসদেব ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ের তিরোভাবের দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদিগের প্রাধান্য লইয়া যে কলহ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রেরই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত—প্রমথলাল সেন দাবি করিয়াছিলেনঃ

Let him stand before the world as he was—and the light of Heaven show him in its true light. Why allow myths to grow about him in the light of the present day. If truth is stranger than fiction—the real Ramkrishna will come out better the less there is myth about him.

পরমহংসদেবকে লইয়া ইতিমধ্যেই যে-সকল গালগল্প ও উপন্যাস রচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সেইগুলির প্রত্যেকটি দেখিয়াই আমাদের সেই দাবি পূরণ করিবার কথা মনে হইয়াছে এবং তাহারই ফলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কাজ করিতে করিতে আমাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে যে সত্য, উপন্যাস অপেক্ষাও শক্তিশালী ও চমকপ্রদ। ভক্তির রঙ চড়াইবার অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই, তাঁহার সহজ সুলভ প্রকাশই এই বিজ্ঞান-শাসিত যুক্তিবাদের যুগে আশ্চর্য্যরকম কার্য্যকরী হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের স্বীকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যঃ

Then in the intensity of that burning love of God which is in his simple heart, the poor devotee's form and features suddenly grow stiff and motionless, unconsciousness overtakes him, his eyes lose their sight, and tears trickle down his fixed, pale, but smiling face There is a transcendent sense and meaning in that unconsciousness. What he perceives and enjoys in his soul when he has lost all outward perception who can say? Who will fathom the depth of that insensibility which

the love of God produces? But that he sees something, hears, and enjoys when he is dead to all outward world there is no doubt. Or why should he, in the midst of that unconsciousness, burst into floods of tears and break out into prayers, songs and utterances the force and pathos of which pierce through the hardest heart, and bring tears to eyes that never wept before by the influence of religion. [পরিশিষ্টে উদ্ধৃত অংশের সহিত পঠিতব্য]

১৮৭৯ সনের অক্টোবর মাসে তিনিই সর্ব্বপ্রথম জোর গলায় এই ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অনেক বাদানুবাদের মধ্যে ১৮৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ষোল বৎসর পরেও পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই।

কালের কঠিন যবনিকা তুলিয়া আমরা কল্পনা-বলে নয়, সমসাময়িকদের দৃষ্টি দিয়া পরমহংসদেবকে যতটুকু দেখা যায় দেখাইয়াছি, আমাদের মনে হয় এইটুকু হইতেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাপ সম্ভব হইবে।

একটি প্রশ্ন পাঠকমাত্রেরই মনে জাগিবে যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যে-কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের প্রচারে এতখানি সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের মনোভাব পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিরূপ ছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'নিউ ডিসপেন্‌সেশন' পত্রিকা হইতে যে-সকল সংবাদ ও প্রশস্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই কেশবের রচনা বলিয়া নববিধান-সমাজ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কোনও বক্তৃতায় বা অন্য গ্রন্থে প্রত্যক্ষতঃ পরমহংস-প্রসঙ্গ নাই। আমরা অনুমান করি কেশবচন্দ্রের 'জীবন-বেদে'র "ভক্তিসঞ্চার" অধ্যায়ে পরোক্ষে পরমহংসদেবের উল্লেখ আছে। 'জীবনবেদে' পরমহংস-প্রসঙ্গ যে আছে, এই ধারণা ১৮৯৬ সনেই অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল, এই সনেই ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু এই ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেনঃ

We can get some idea of the nature of influence which Keshab Chandra Sen is said to have received

[স্রোত

from the Paramhansa from what he has written of himself in his Jeevan-veda or autobiography.

আমাদের গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের—গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) ও গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের সাক্ষ্য সংবাদে ও স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত হইয়াছে। যে দুই জনের সাক্ষ্য আমরা গ্রন্থমধ্যে দিই নাই, এইখানেই তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম। কেশবের সুবিখ্যাত জীবনীকার ও বন্ধু *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen* গ্রন্থের লেখক আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেনঃ

And now [1879] the sympathy, friendship, and example of the *Paramhansa* converted the Motherhood of God into a subject of special culture with him [Keshub]. The greater part of the year 1879 witnessed this development. It became altogether a new feature of the *Revival* which Keshub was specially bringing about. . . He [Paramhansa] was a believer in idolatry, and yet a faithful and most devoted mediator of the perfections of the Great Formless One, Whom he called অখণ্ড সচ্চিদানন্দ (the undivided truth, wisdom, and joy). This strange eclecticism suggested to Keshub's appreciative mind the thought of broadening the spiritual structure of his own movement. 3rd ed., pp. 228-29, 241-42.

দ্বিতীয় সাক্ষ্য দিয়াছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তিনিও এই সময়ে কেশবের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ "এই সময়ে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত কেশববাবুর আলাপ হয়। তাঁহার জীবন্ত বৈরাগ্য দর্শনে কেশববাবু বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে [শান্তিপুর হইতে] পত্র লেখেন, আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে বৈরাগ্য ভাব প্রবেশ করে তজ্জন্য তিনি বাস্তবিক

চেষ্টা করিতেছেন।" ('ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়,' ২য় সংস্করণ, প‍ৃ ৫২-৫৩)

নানা কারণে বিষয়-বিন্যাসে আমাদের কিছ‍ু ত্র‍ুটি রহিয়া গেল। অসম্প‍ূর্ণতার উল্লেখ প‍ূর্ব্বেই করিয়াছি। এখন আমাদের অধ্যায়গ‍ুলি সম্বন্ধে কিছ‍ু নিবেদন করিতেছিঃ

১। সমকালীন সাময়িক-পত্রে রামকৃষ্ণ-কথাঃ

'স‍ুলভ সমাচার' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র সকল সংখ্যা আমরা পাই নাই, অথচ জানিতে পারিয়াছি আরও কিছ‍ু সংবাদ এইগ‍ুলিতে আছে। *Theistic Quarterly Review* পরে পাওয়াতে ইহা হইতে উক্তিগ‍ুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

২। সমসাময়িকদের গ্রন্থে পরমহংস-কথাঃ

বৈষ্ণবচরণের সংস্কৃত ভাষায় পরমহংস-প্রশস্তি-গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান পাই নাই।

৩। সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্ম‍ৃতিকথাঃ

পরমহংসদেবকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন এই স্ম‍ৃতিকথাগ‍ুলি তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী ও গ‍ৃহী শিষ্যভক্তদের স্ম‍ৃতিকথা আমরা সম্প‍ূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছি।

৪। সমসাময়িক গ্রন্থঃ

সমসাময়িক গ্রন্থ অর্থে আমরা সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থ ব‍ুঝিয়াছি। অধিকাংশ গ্রন্থই তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছে, আধ‍ুনিক কালে প্রকাশিত গ্রন্থও আছে।

৫। উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

এইগুলি সমসাময়িক নয়, সকলগুলির প্রথম প্রকাশকালও জানা যায় নাই। তবে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থই আমরা তালিকাভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই অধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থরূপে আচার্য্য প্রতাপ-চন্দ্রের পুস্তিকাটির প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৭ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৬ সনে *Interpreter and the Young Man* পত্রে প্রকাশিত উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের প্রবন্ধে দেখিতেছি ইহা ১৮৭৬-১৮৭৯ সনের মধ্যেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। পরিশিষ্ট

প্রথমাংশে পরমহংসদেবের জীবিতকালে এবং তিরোভাবের অব্যবহিত পরে যে-সকল উক্তিসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল কেশবেরটি ছাড়া সকলগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

শেষাংশে কয়েক জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলিও সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের বাদ দিয়াছি।

এই গ্রন্থপ্রকাশে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া রহিলেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সালে লিখিত]

সূচী

সমকালীন সাময়িক-পত্রে রামকৃষ্ণ-কথা ... ১-৮৫

তিরোভাবের পূর্বে ১-৩৭

তিরোভাবের অব্যবহিত পরে ... ৩৮-৮৫

সমসাময়িকদের গ্রন্থে পরমহংস-কথা ... ৮৭-৯৪

সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা ... ৯৫-১১৬

সমসাময়িকদের গ্রন্থ ১১৭-১৩৬

তিরোধানের পূর্বে ১১৯-১২০

তিরোধানের পরে ১২১-১৩৬

উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গ্রন্থ ১৩৭-১৪৫

পরিশিষ্ট ১৪৯-২০৮

সমসাময়িক উক্তি-সংগ্রহ ... ১৪৯-১৯৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৯৫-২০৮

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়

সাং কামারপুকুর

সমকালীন সাময়িক-পত্রে
রামকৃষ্ণ-কথা

তিরোভাবের পূর্ব্বে

[The *Indian Mirror*, 28 March 1875]

A HINDU SAINT.—We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep sense of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.

['ধর্ম্মতত্ত্ব,' ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক; ১৪ই মে ১৮৭৫]

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণ-কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিম্বা একাদশ তখন হইতে ইঁহার মনে অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যেখানে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী দেখিতে পাইতেন সেইখানে গিয়া ইনি বসিয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণের পিতাও এক জন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতেন পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। লেখা পড়া শিখিলে পৌরোহিত্য ব্যবসায় করিতে হইবে এই ভয়ে সে দিকে কখন যাইতে চাহিতেন না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রামকৃষ্ণ কিছু দিন তাঁহার নিকটে ছিলেন। যৎকালে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন* তখন রামকৃষ্ণ

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ২ চৈত্র ১২৫৯ (১৪ মার্চ্চ ১৮৫৩) তারিখে এই প্রসঙ্গে লেখেনঃ—"আমরা শুনিতেছি. . .শ্রীমতী

তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুর বাবু রামকৃষ্ণের ঔদাস্য ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে কালীদেবীর মন্দিরে তাঁহাকে পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণ এইরূপে কিছু দিন থাকেন, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজান আর ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে স্পৃহা বা স্বার্থপরতা তাঁহার ছিল না। এক দিন কালীপূজা করিতেছেন, করিতে করিতে নৈবেদ্য ফুল চন্দন ঠাকুরের মাথায় না দিয়া আপনার মাথায় দিতে লাগিলেন। কখন বা কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। মথুর বাবু এক দিন ইহা দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার রামকৃষ্ণের উপর আরও ভক্তি বৃদ্ধি হইল। তদনন্তর এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটীর পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটি রমণীয় স্থান আছে তথায় তিনি দিবা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন স্ত্রীলোকের বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতি বোধ না হইলে রিপু জয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখন সখীভাবে কখন বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য বলেন, দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। কালী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা পর্য্যন্ত জপ করিয়াছেন। শরীর রক্ষার ভার হৃদয় নামক উক্ত শিষ্যের উপর ছিল, তিনিই আহার করাইয়া দিতেন। এখনও তিনি ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

রাসমণি আগামী বৈশাখীর পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির, ও অন্যান্য দেবালয়, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিত্র কর্ম্মোপলক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।"

মাহিষ্যকুলোদ্ভবা রাণীর পৌরোহিত্য করিতে প্রথমে কেহ স্বীকৃত না হওয়ায় মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকার্য বিলম্বিত হইয়াছিল। ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়– ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (৩১ মে ১৮৫৫), বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন। মন্দিরাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে রাসমণির প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা শাল স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসারবাসনাশূন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখন সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবেতেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। এত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্ব্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্ম্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তকথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় সে সকল তিনি অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন শরীরের সকল অঙ্গই সমান তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বর অতি সুমিষ্ট। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সরলভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই একটি গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় না। ধর্ম্মবিষয়ে মতামত তাঁহার যাহাই হউক, তিনি এক জন সরল সাধক এবং প্রেমিক ভক্ত। উৎসাহ এবং ভাবুকতা যথেষ্ট আছে। এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্ব্বদা বিভুগুণ কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তথাপি যথেষ্ট উৎসাহের ভাব আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। তাঁহার স্বভাব অতি বিনম্র ও সরল, দেখিতে পাগলের ন্যায় অথচ ধর্ম্মবুদ্ধি বিলক্ষণ উজ্জ্বল। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনের অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন মাখিয়া বাতাস করিতে হইত এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, ধ্যান করিতে গেলেই মূর্চ্ছা হয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছে।

সংসার এবং সাংসারিক লোকের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি বলেন, অনেকে আমার নিকট পূর্ব্বে আসিত, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কেহই ব্যাকুল নহে, সকলের মধ্যেই গোলযোগ দেখিতে পাইলাম। মনুষ্যের সাধনের বল এবং ঈশ্বরের করুণাবল সম্বন্ধে তাঁহার একটি দৃষ্টান্তকথা আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সে বিড়ালের বাচ্চা, আর সাধনের বলের উপর যাহার নির্ভর সে হনুমানের বাচ্চা। বিড়ালের বাচ্চা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে তাহা সে জানে না। আর যে হনুমানের বাচ্চা সে মাতৃবক্ষস্থল প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে পেটের নীচে রাখিয়া যেখানে সেখানে দৌড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণ বলেন আমি বিড়ালের ছানা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানি। আর একটি উৎকৃষ্ট কথা এই যে, শিশু যখন রাঙ্গা লাঠি পাইয়া ভুলিয়া খেলা করে মাতা তখন কার্য্য করিতে থাকেন, যদি সে কাঁদিয়া উঠে অমনি মাতা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। সংসারাসক্ত মনুষ্য বালক সমান, ঈশ্বর তাহার জননী, যাই সে মাতার জন্য কাঁদিবে অমনি তিনি তাহাকে দেখা দিবেন। যখন সে সংসাররূপ রাঙ্গা লাঠি লইয়া খেলা করিতেছে তখন মাতা বলেন—ও খেলা করিতেছে করুক, আমি এখন অন্য কাজ করি। এক জন লোক লেখা পড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কত দূর ধার্ম্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মত এক জন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।

[The *Indian Mirror,* 20 February 1876]

THE BRAHMO SAMAJ.—Ramakrishna, a Hindu devotee known as a Paramahamsa, now living at Dakshineswar, is a remarkable man, and appears to have attained an extraordinary elevation of moral

character and spirituality. Several Brahmo missionaries who have visited him from time to time speak highly of his devotion and purity and his deep insight into the realities of the inner world. Though a true Hindu he is said to sympathize heartily with the Brahmos of the advanced schools.

[The *Indian Mirror,* 11 February 1877]

THE BRAHMO SAMAJ.—Ramkrishna Paramhansa, a Hindu devotee of a very unusual type, who has sympathy with our movement, now and then has interviews with our leaders. His physical condition being very debilitated and his heart susceptible of strong religious impulses he cannot bear the pressure of feelings and often becomes unconscious and is subject to cataleptic fits.

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই মাঘ ১৭৯৯ শক; ২৮এ জানুয়ারি ১৮৭৮]

৯ই [২১ জানুয়ারি ১৮৭৮] সোমবার—প্রাতে আচার্য্য ভবনে উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়া বেলঘরিয়ার উদ্যানে গমন করেন। এখানে সে দিন পরমহংস রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ চিরদিনই নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হয়েন। বিশেষতঃ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ যাঁহারা ইঁহাকে কখন দেখেন নাই তাঁহারা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া সকলে নগরে প্রত্যাগমন করেন।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই শ্রাবণ ১৮০০ শক; ৩১এ জুলাই ১৮৭৮]

নূতন পুস্তক।

পরমহংসের উক্তি ... ৵১০*

* বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৮, পৃঃ সংখ্যা ১০। ইহা যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাহারও উল্লেখ আছে।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই মাঘ ১৮০০ শক; ২৮এ, জানুয়ারি ১৮৭৯]

১২ মাঘ [২৪ জানুয়ারি ১৮৭৯] শুক্রবার বেলঘরিয়া তপোবনে বন্ধু সমাগম হয়। প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় উপস্থিতিতে সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল বিষয় বলিয়াছিলেন তাহা অতি সারবান্ এবং শিক্ষাপ্রদ।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই ফাল্গুন ১৮০০ শক; ২৭এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯]

১২ই মাঘ শুক্রবার বেলঘরিয়া তপোবনে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ—

১। ঈশ্বরকে ভুলিয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া মত্ত থাকা অবিদ্যার খেলা। ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গে আমোদিত হওয়া বিদ্যার খেলা। সংসারী বদ্ধ জীবেরা কিরূপে দুই পয়সা অর্জ্জন করিবে, সর্ব্বদা এই ভাবে। বিদ্যার খেলা তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা আপনারাও হরিগুণ গায় না, অন্যকেও হরিগুণ গান করিতে দিতে চায় না, বন্ধু বান্ধবদিগকেও মায়াহ্রদে ডুবাইতে চেষ্টা করে।

২। যেমন শাঁকোর জল এক দিক্ দিয়া আসে এবং অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ মুক্ত জীবের হস্তে যে বিষয় সম্পদ আসে, তাহা সদ্ব্যয়ে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

৩। মুমুক্ষু জীব সংসার ভোগ করে; কিন্তু সে জানে ঈশ্বরই কেবল সত্য, স্ত্রীপুত্রাদিপূর্ণ এই সংসার মিথ্যা, এই জন্য সে মনে মনে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া কিরূপে ঈশ্বরকে পাইবে এই জন্যই ব্যস্ত থাকে।

৪। যেমন উকীলকে দেখিলে কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেইরূপ ভক্তকে দেখিলে জগতের রাজাকে মনে পড়ে।

৫। বড় লোকের মাল বিষয় অনেক, তাঁহারা অনেক লোককে তাহা বিতরণ করেন, স্বার্থপর সাধক কেবল নিজেই আমটি খায়। মহাজন ষ্টীম্ বোটের ন্যায় আরও অনেক লোককে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া শান্তিধামে চলিয়া যান।

৬। সাধু লোকের স্বভাব প্রদীপের ন্যায়। সাধু শত্রু মিত্র উভয়ের নিকট তাঁহার সাধুতার সৌরভ বিস্তার করেন, যেমন প্রদীপ স্বভাবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠক এবং জালকারী উভয়কেই আলোক দেয়।

৭। প্রেমভক্তিতে অহংত্যাগ হয় এবং ঈশ্বরেতে মমতা জন্মে।

৮। গুজরত খোদ সোণার প্রতি লোভ করিবেন দূরে থাকুক যে তাঁহার নাম লয় সেও বিষয় সুখকে কাকের বিষ্ঠাবৎ হেয় মনে করে।

৯। এক জন ভক্ত ঈশ্বরকে বলেছিলেন, তোমার চিন্তা ক'রে আমি পাগল হইয়াছি, এখন কিছু কাল তুমি আমার চিন্তা কর।

১০। জ্ঞানের রূপ পুরুষ, ভক্তির রূপ স্ত্রী।

১১। ভগবানের শক্তি লক্ষ্মী সকলকে ধন সম্পদ দান করেন, তাঁহার শক্তি সরস্বতী বিদ্যা দান করেন।

১২। অগ্নি সর্ব্বত্র আছে; কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির উজ্জ্বল প্রকাশ হয়, সেইরূপ মা সকল জীবের শরীর রূপ চিকের ভিতর ধনীর কন্যার ন্যায় লুকাইয়া আছেন, কেবল বৈরাগীই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যত দিন বিবেক বৈরাগ্য আগুনে মায়া-রস শুকাইয়া না যায় তত দিন মাকে কেহ ভালরূপে দেখিতে পায় না।

১৩। মকরধ্বজ জমিয়া গেলে বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে সেইরূপ প্রভুর ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়া গেলে মনুষ্যের শরীরের আর প্রয়োজন থাকে না। সোণার প্রতিমা ঢালা হলে আর মাটির ছাঁচে (শরীরের) প্রয়োজন কি?

[The *Indian Mirror,* 15 June 1879]

A Visit To The Yogi Of Dakshineswar.—Ramakrishna is not educated in the English sense of the term. His views may be anything but pleasant to hear and his notions of gallantry or propriety are such as will probably shock the fastidious tastes of Western critics. I can assure the reader, however, if the Yogi is not gallant is pure. If there is not warmth in his feelings about a woman, the place which he assigns her in the kingdom of God is far higher than any which the passions of men might reach. Our good hermit thinks that any extended scale of devotion or communion is impossible so long as there is lust to distract or a woman to seduce the heart from the

way of heaven. Every devotee should be absolutely proof against any influence of the kind. In that the mind being free from every sort of distracting influence, may proceed uninterruptedly to its earnest search of the Almighty: but how to be thus free, how to be proof against lust?

The method is to resort to the most violent pains for the purpose of extinguishing lust. If I am asked to state my opinion as to whether the mode alluded to is practicable or beneficial I shall say that I do not know. For surely it has been feasible in one or two cases, or why was it resorted to at all? But to enforce it as a rule in all cases would be the height of absurdity. The same remark perfectly applies to Sri Ramakrishna's method. But let us see what it is. I have to only recall the figure used in my last letter, *viz.* that the door-keeper at the mansion of heaven is a woman; now in what way is one to overcome the superior power of this being? Sri Ramakrishna says there are three ways of doing it.

The first is what is called the "heroic" method—and its principle is the defeat of sin brought on by indulgence in sin. Let a man go straight to the door-keeper and attain satiety and complete reaction by indulging in every sort of sexual pleasure. This is the most hideous principle which depraved imagination has invented for the purification of the heart. Yet it is a melancholy fact that hundreds, thousands of depraved men and women are pursuing this suicidal course at the time of the day.

The second method consists in assuming the female nature. If a man puts on a woman's dress, imitates her manners and cultivates the tenderest feelings of female nature and in this way forgets his own manhood, verily he cannot look on woman with evil eyes. He greets her as his handmaid and in this way gets access to heaven.

The third is called the "filial" method and it means that the devotee is to learn to call a woman by the name of Mother; for if he is a son he cannot possibly commit lust in his heart. Now this may appear to most readers as transcending God's evident intentions and violating nature's beneficent laws. But the fact is there. Ramakrishna owes much of his success to the last mentioned method. The trial and temptations which he voluntarily underwent are marvellous to those who: "since it is hard to combat learn to fly," He was tempted in a hundred different ways—but from every blast of the furnace he came out and shone as the purest and brilliant metal.

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন ১৮০১ শক; ১লা অক্টোবর ১৮৭৯]

পরমহংসের উক্তির সার।

বেলঘরে বাগান, সোমবার ৩১ ভাদ্র ১৮০১ শক।

১। বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছ দেখা যায় না, ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ দুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায় পরে বড়শিবিদ্ধ হয়। তেমনি ভগবান্ ঘন চিদানন্দ সাগরের গভীর জলে থাকেন, যোগ ধ্যান ও প্রেম ভক্তির চার দিতে দিতে কখনও কখনও দৈবাৎ তিনি আসিয়া দেখা দেন, তৎপরে ধরা দিয়া থাকেন।

২। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাতে যাহার মন রমণ করে তাহার আর বিষয়-লালসা থাকে না।

৩। সতী স্ত্রী বিদ্যার শক্তি। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বামীদিগকে বিষয়সুখের জন্য লালায়িত দেখিলে সাবধান করিয়া বলেন, ছিছি জঘন্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর। যে সকল মন্দ স্ত্রী অবিদ্যার শক্তি তাহারা ভগবদ্ভক্ত পতিদিগকেও সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে।

৪। যে গরুর মস্তকে গোরোচনা থাকে সে দলের অন্যান্য

গরুর অগ্রে অগ্রে গমন করে, সেইরূপ যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে তিনি অপর সকলের নেতা হন।

৫। নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না। তিনি একভাবেই আছেন, অথচ তাঁহার লীলা পরিবর্ত্তনশীল। বৃক্ষের ছায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বৃক্ষের মূল দেশ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে।

৬। তুমি এবার দুর্গোৎসব কর নাই কেন? আমার দাঁত নাই। আর এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিল, আমার মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কিছু মাংসের জুশ দিও।

৭। হস্তীর দুই প্রকার দন্ত, এক দেখাইবার জন্য অন্য প্রকার দন্ত আহারাদি করিবার জন্য। তেমনি সঙ্গীতাদিও দুই প্রকার, এক প্রকার সঙ্গীত লোককে শুনাইবার জন্য, অন্য প্রকার ভোগ করিবার জন্য।

সংবাদ।—···বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সে দিন ঈশ্বর দর্শন ও যোগ প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কত বার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কত বার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কত বার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব

দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়। ৬ই রবিবারে অপরাহ্ণে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনেও পরমহংস মহাশয় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সে দিনও তাঁহার সমুদায় ভক্তিভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। কেবল সুমধুর নৃত্য হয় নাই। তাঁহার সুমিষ্ট স্বরের মধুর ভাবের সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সে দিন সমাধির অবস্থায় তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ ঘন এই নাম শ্রবণ মাত্র তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই কার্ত্তিক ১৮০১ শক; ১লা নবেম্বর ১৮৭৯]

পরমহংসের উক্তির সার।

কমল কুটীর ৬ই আশ্বিন ১৮০১ শক।

১। আনন্দময়ী ভৌতিক জগদ্রূপ চিক্ ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর থাকিয়া খেলা করিতেছেন।

২। কোন জীবই একেবারে উপবাসী থাকে না, তবে কি না কেহ নয়টার সময়, কেহ দুইটার সময়, কেহ বা সন্ধ্যার সময় আহার করে। সেইরূপ সকলে কোন না কোন সময় ভগবানকে দেখিবে।

৩। লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনী প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হয়, যিনি পৃথিবী সৃজন করেন তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহে না। প্রায় সকলেই বাগান ও পরীর মূর্ত্তি দেখে ভুলিয়া যায়; কিন্তু যাঁহার বাগান এবং পরী তাঁহাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে চায়। স্ত্রীলোকেরাই পরী, তাহারা মোহিনী মায়া। মেয়ে আর মায়া এক। অবিদ্যারূপ মেয়ে কাল সাপের ন্যায় পুরুষের চৈতন্য হরণ করে। কিন্তু যাঁহারা প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে সেই ব্রহ্মময়ী ঈশ্বরীকে দেখিতে পান তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক মেয়ে সেই জগজ্জননীর প্রেরিতা।

৪। কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিল, আমি আমার দাদাকে দেখিতে যাইব। দাদা শীঘ্রই সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন। স্বামী বলিল, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে সে সন্ন্যাসী হইবে। স্ত্রী বলিল, দাদার ষোলটি স্ত্রী, তিনি একে একে অনেকগুলি ছাড়িয়াছেন, এবং শীঘ্রই অন্য কয়েক জনকে ছাড়িয়া তিনি বৈরাগী হইয়া বাহির

হইয়া যাইবেন। স্বামী বলিল, তোমার দাদা কখনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না, যে একে একে ছাড়ে সে সন্ন্যাসী হইতে পারে না। স্ত্রী বলিল, তোমা অপেক্ষা আমার দাদা ভাল, তুমি কিছুই ছাড়িতে পার নাই, আর দাদা কত স্ত্রীকে ছাড়িল। স্বামী বলিল, আমি এখনই সব ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে পারি। স্ত্রী বলিল, তুমি আমাকে ছাড় দেখি? স্বামী বলিল, তুমি আমার মা, আর এই দেখ আমি কৌপীন পরিয়া চলিলাম। এই বলিয়া স্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যে অল্পে২ সংসার ছাড়িবে বলে সে কখন পারে না।

৫। এক জন বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিলেন, এই সংসার অসার মায়া। আমার ছেলে হরিশের একটি গতি করিয়া দিতে পারিলে, ছোট মেয়েটির বিবাহ দিলে এবং তাহার যে কন্যা হইবে তাহার বিবাহের একটি ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমি কাশীবাসী হইব। যে এত খতিয়ান্ করে সে আবার বলে সংসার মিথ্যা।

সংবাদ।—গত বুধবার [১৩ কার্ত্তিক] শারদীয়া পূর্ণিমা উপলক্ষে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে মন্দিরে উপাসনা হয়, অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম বিদ্যমান, অন্ন ঈশ্বরের সত্তা ও স্নেহ দয়া প্রকাশ করিতেছে এ বিষয়ে জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করা যায়। একখানা বজ্‌রা ও ৬খানা ভাওয়ালিয়া ২খানা ডিঙ্গি প্রায় আশি জন যাত্রি লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকদিগের মধ্যে ১০।১২ জন ব্রাহ্মিকা ছিলেন। বজ্‌রা পতাকা ও পুষ্পপল্লবালঙ্কৃত হইয়াছিল। খোল করতাল ও ভেরীর ধ্বনি সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পঁহুছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর, বজ্‌রায় আসিয়া প্রমত্ত ভাবে "জাহ্নবীতীরে হরি ব'লে কে রে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে" এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েক দল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। "সচ্চিদানন্দ

বিগ্রহরূপানন্দ ঘন” সকলে এই সংকীর্ত্তনটি করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইল। সমাধি ভঙ্গ হইলে পরব্রহ্মস্বরূপ, ও আমিত্ব নাশ বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বান্ধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন তাহাতে ব্রহ্ম প্রেমের গভীর তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের মধুর ভাবে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। উপদেশ শ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নূতন রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। “মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়!” সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না। এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান অবস্থায় পুনর্ব্বার সমাধি প্রাপ্ত হন। রাত্রি ৮টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল।

[The *Sunday Mirror,* 2 November 1879]

EDITORIAL NOTES.—The Paramhansa of Dukhinessur, to whose hermitage we paid a visit on the occasion of the moonlight festival, completely lost his senses when he heard the procession chant the name of God before him. This is what we call being intoxicated or maddened by communion with God. The very sight of a man showing his love to Hari renders him literally insensible with joy. The sight we saw there is worth seeing by all means.

১৮৭৬ খৃীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখের The *Sunday Mirror*এ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হইয়া-

ছিল, লিখিয়াছিলেন কেশব-ভক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। এই প্রবন্ধটিই আবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা The *Theistic Quarterly Review* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে উদ্বোধন কার্য্যালয় কর্ত্তৃক ইহা *Paramahamsa Ramakrishna* নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইতেছে। ১৮৭৬ সালের ১৬ই এপ্রিলের এই রচনাটিতে পরমহংসদেবের কথা—"উক্তি" হিসাবে সর্ব্বপ্রথম বিধৃত হইয়াছে। পুস্তিকায় এগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। উক্তিদশক এই :

"১। ভ্রমর যতক্ষণ পদ্মফুলের বাহিরে থাকে ততক্ষণই গুন-গুন শব্দ করে; ফুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু পান করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার গুনগুন শব্দ থাকে না। ভ্রমর মধুপান করিয়া শব্দ করিতে ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সাধকও এইরূপ।

২। নির্ম্মল স্রোতজলে ঘড়া বা কলসী ডুবাইবার সময় বগ্‌বগ্ করিয়া কতই না শব্দ হয়; যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণই শব্দ থাকে; জলপূর্ণ হইলে আর শব্দ হয় না; নিঃশব্দ ও পূর্ণ কলসী গভীর জলে শান্ত হইয়া অবস্থান করে। সাধকও সেইরূপ।

৩। চিনি জ্বাল দিবার সময় যতক্ষণ চিনিতে গাদ থাকে ততক্ষণ ধূম ও দুর্গন্ধ উঠে। চিনি পরিষ্কৃত হইলে ধূমও থাকে না, শব্দও থাকে না; পরিষ্কৃত চিনির রস টলটল করে; গলিত বা জমাটবান্ধা সেই রস সেইরূপে দেবতা ও মনুষ্যের আনন্দ বর্দ্ধন করে। বিশ্বাসীর স্বভাবও এইরূপ।

৪। ভয়ানক সংসারস্রোতে আমি একখানা জীর্ণকাষ্ঠের তরী বাহিয়া যাইতেছি; অন্য লোক জীবনরক্ষার জন্য যদি আমাকে ধরে, তবে আমরা উভয়েই ডুবিয়া মরিব। গুরু করিতে সতর্ক হও।

৫। কাঁটা ও কঙ্করের উপরে খালি পায়ে কে যাইতে সাহস করে? শ্রীহরিতে বিশ্বাস থাকিলে কোন্ কাঁটা ও কঙ্কর তোমায় আঘাত করিতে পারে?

৬। যে খুঁটি মাটিতে ভালরূপে প্রোথিত আছে, সেই খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে মাটিতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় থাকিলে তোমার গতি যত কেন ত্রস্ত হোক্ না তুমি কোনই আঘাত পাইবে না; বিশ্বাস না থাকিলে পদে পদে পতন।

৭। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে টাটকা দুধ টানিলেই উত্তম মাখন উঠে এবং তাহা পরিষ্কৃত জলে ভাসে। সূর্য্যোদয়ের পর ঘোল টানিয়া যে মাখন বাহির করা যায়, তাহা ঘোলের সঙ্গেই লিপ্ত থাকে; পৃথক্‌ভাবে জলে রাখা যায় না। শেষোক্ত মাখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত মাখন যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের উপমাস্থল।

৮। কামকাঞ্চনে জগৎকে পাপে ডুবাইয়াছে। স্ত্রীলোককে বিদ্যাশক্তি বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে স্ত্রী-প্রলোভন থাকে না। পবিত্র জ্ঞান-শক্তিই জগতের মাতৃস্থানীয়া।

৯। মাগো! আমি লোকের নিকট সম্মান চাই না। শারীরিক সুখ চাই না; গঙ্গা-যমুনার চিরসঙ্গমস্থল তোমার নিকট আমার আত্মা উড়িয়া যাক। মা! আমার যোগ নাই, ভক্তি নাই, আমি দীন ও বন্ধু-হীন। আমি কাহারও প্রশংসা চাই না। আমার মন তোমার পাদ-পদ্মে বাস করুক।

১০। ঈশ্বরই সত্য, অন্য সবই মিথ্যা।”

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই ফাল্গুন ১৮০১ শক; ২৭এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০]

১৪ই মাঘ [২৭ জানুয়ারি ১৮৮০] মঙ্গলবার বেলঘরিয়া তপোবনে সাধন ভজন। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মগণ বেলঘরিয়া তপোবনে গমন করিয়া বৃক্ষতলে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ধারণা করেন। সায়ংকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস আগমন করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহার উক্তিসকল চিরদিনই সকলের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এবারেও যে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

[The *New Dispensation*, 26 May 1881]

Sadhu Sanga; or the companionship of saints and devotees, is justly regarded as one of the essential means of sanctification, and we are gratified to find among our brethren a desire to avail themselves of such means whenever an opportunity presents itself. Dayananda Saraswati, the great Vedic reformer, the Paramhansa of Dakhineswar, the Shikh Nagaji of Doomraon and the Pahari Baba of Ghazipur are, so

far as we know, the four distinguished ascetic saints whom our friends have from time to time duly honored, and in whose company they have sought the sanctifying influences of character and example. May we respect and serve with profound reverence and humility every ascetic saint whom Providence may bring unto us! The impure become pure in the company of *Sadhus*.

There was a large gathering of our friends at Dakhineswar, on Tuesday last, to pay their respects to the Venerable Paramhansa. The party proceeded in a steamer, and reached the place at about 5-30 P.M. Others had assembled earlier. Altogether there were more than eighty persons present. The conversation, which was deeply spiritual and instructive, lasted over an hour, and was followed by hymns chanted by our Singing Apostle. As the shades of the evening gathered, the garden and the river side looked most romantic and charming, and eminently fitted for devotion. The party returned, some in carriages, some by rail on the other side of the river, while the rest walked all the distance. It was a pleasant evening, and showed how highly the Paramhansa is esteemed by all classes of the Native community. His liberality is indeed a great attraction. One of the most noteworthy things he said the other day was that he believed in the identity of Janak and Nanac. After the death of the former the Lord blessed his spirit, and expressed His joyful appreciation of the Rishi's life. Greatly pleased, He said to him to the following effect,—'Well done, good Rishi. Thou hast sanctified many by thy purity and asceticism, and by the [illegible]ble example of a self-denying king thou hast set. [illegible] good a teacher, thou shalt not sleep in heaven, but thou shalt go again into the world. Thy services, O Janak, are required

in the Punjab. Go there, harmonize the scriptures, and draw together hostile sects. O thou apostle of union and reconciliation." In this anecdote one cannot fail to notice the doctrine of unity which forms the corner-stone of the New Dispensation.

[The *New Dispensation,* 7 July 1881]

In the course of an animated conversation with our devotees, the Paramhansa of Dakhineswar lately expounded the Hindu doctrine of Trinity. He spoke of "Bhagaban," "Bhagavat" and "Bhakta" as three entities, yet one in essence,—the mysterious three in one. The first signifies the Godhead; the second, Scripture or Word; the third, Devotee or Saint.

[সুলভ সমাচার, শনিবার, ১৬ শ্রাবণ ১২৮৮;

৩০ জুলাই ১৮৮১]

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পাঠকগণ উপরিউক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যত বার দেখিতেছি, তত বার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কি না সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ী, ধন, মানের কথা কহি ও সর্ব্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখন হরি বলিয়া [illegible]তে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন, কখন মা কালী ব[illegible] অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্ম্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার

মনে প্রবল হয় তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান আর রাখিতে পারেন না। একখানি তক্তার মতন তাঁহার সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, মাটীর হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময়, কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটি চিন্ময় ভাব-রূপে লহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে কাল বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে তিনি মা'র কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মা'র কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন। কখন কখন আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এই ভাবে থাকিতেন, তাঁহার আহারাদি বাহ্য ক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন পরিচারককে বলিতেন, এই বেলা আমাকে আহার দেও, সে ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। [illegible] আবার বাহ্যজ্ঞান-শূন্যে হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে [illegible]ন তাঁহাকে লইয়া নানা ভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার ষ্টীমারে বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবী[illegible] আনিয়া [illegible] ভিতর দিয়া তাঁহাকে

দেখিতে বলিলেন; তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখন আমার মন ব্রহ্মের ভিতর ডুবিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিষ যে তাঁহার ভিতর হইতে মন উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর দিব। পরমহংস মহাশয়ের নিকট আমরা এত উচ্চ উচ্চ এবং নূতন নূতন কথা শুনিতে ও ভাব দেখিতে পাই যে তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই 'সুলভ' পরিপূর্ণ হয়। অদ্য আমরা তাঁহার উপরিউক্ত কয়টী কথা উপহারস্বরূপ পাঠক মহাশয়দিগকে দিতেছি, ভরসা করি এগুলি গ্রাহ্য হইবে।

[The *New Dispensation*, 9 September 1881]

LESSONS GATHERED.—THAT beloved child of God, and child-like, the Paramhansa of Dakhineswar, honored the minister's Asram with another visit, on Tuesday last, and, as usual, spoke wisdom and love, sang and danced with joy. Rich and varied were the illustrations which he used. Some of these we shall cite for the reader's benefit. (1) The young lady in the house is kept employed in all manner of household drudgery from morning till night, and has no rest. When she is about to become a mother she is gradually relieved of all work, and is allowed to remain quiet. When the child is born, she not only manifests a distaste for work, but she day and night does little besides caressing and kissing the little baby, and finds happiness in it alone. So the soul works and seeks salvation in work. But as soon as it becomes fruitful it gives up all outward work. When true wisdom is born, there is an end to the religion of dry work and the soul rejoices in wisdom, the fruit of all spiritual culture. (2) The hidden magnet in the depths of the sea suddenly loosens all the iron nails and screws of the vessel, and at once it breaks into pieces and is lost. So by true wisdom the bonds and chains of the vessel of life, selfishness, pride, lust, anger etc., are instantaneously cut, and the solid mass so well fastened melts

away in Divine love and resignation. (3) *Ego* is no substance. It is only coating over coating, like onion. Remove the coats one after another, and you see nothing is left. So by stripping humanity of its outer and inner coat you find nothing left of man. What remains is Divinity. By unfolding self I find Him. (4) All, all is Narayan or Divinity, said the Guru to the disciple, and the latter blindly accepted the doctrine. A big elephant led by its *mahut* or driver was passing through the streets the disciple happening to come in the way, the driver warned him to move, but in spite of repeated warnings he persisted in standing unmoved where he was. At last the huge animal moved on, took the man by the trunk, and flung him away. He was bruised and hurt, and he argued within himself,—"How can this be? I am Narayan, the elephant too is Narayan. How can the two clash? Why should I come to grief by following the Narayan in me? Let me go to my Guru." On his representing fully what had happened, the Guru remarked,—"You must remember, as I said to you, that 'all is Narayan. Self-Narayan and Elephant-Narayan, you do well to acknowledge, but why deny the Mahut-Narayan? Did he not dissuade you and give you timely warning? You have come to grief because you disregarded his warning."

[The *Indian Mirror*, 9 October 1881]

Editorial Notes.—Friday was the day set apart for our autumnal festival. So we went to Dakshineswar to pass a few hours in a friendly talk with the good Paramahansa with whom our readers have become probably quite familiar by this time. More than fifty gentlemen were present on the occasion. The first thing that as usual edified us was the sight of this holy person in a trance. Ramakrishna is a man

marvellously susceptible of religious impressions and whenever he hears somebody speak lovingly and genuinely of the Lord, he is so much moved that he cannot contain himself and much against his own will is literally lost in rapture of his emotional pleasures. He loves our minister and whenever we accompany the latter to Dakshineswar on a visit to the good man, the first thing that greets our eyes is a profound, respectful sincere and affectionate bow on each side and then the complete immersion of the saint in a few minutes' trance. That is the work of *love*. He regains his consciousness little by little and when he is half awake begins the conversation as edifying in its nature as it is marked by all the humour and humility that characterizes a genuine son of God. One thing is remarkable about his discourses. He never states many propositions, but the largest portion of what he says is taken up with illustrations. And what illustrations they are! Facts drawn from the commonest incidents of life, familiar sights and commonplace details are combined and enlarged upon with such infinite sagacity and humour as suffice to suggest, as soon as you have taken your seat before him for a few minutes, that you are before no ordinary person. The subject of our talk on Friday last was the renunciation of self—a topic which he always likes to descant upon. Two obstacles, according to him, lie in the path of spiritual regeneration—the love of woman and the love of money, and on this day he discussed whether it was possible for a regenerated man to live in the world and yet be above it. Those who affect piety are not necessarily above the world, for like vultures and kites they soar very high, heavenward as they presume but yet their hearts are towards the drains and ditches where lie the carcasses they feed upon. But one who is freed from self remains in the

world like a cord that is burnt: the similitude of the cord is seen, but the least wind disperses the ashes, like the boiled paddy that seems like the grain and is yet unable to produce other grain; in other words the liberated soul moves about in its affairs, and retains every semblance of the ego, and yet it is not in reality the ego, but something above it. It is possible for such a soul to remain here in activity and yet be unsullied and unaffected by the passing impurities, as it is possible for a flint stone to remain immersed in water and when brought out, to give the same sparks of fire that came from it when it had not touched water. The flint does not lose its fire by being immersed, and so the liberated soul does not lose its heavenly warmth even when it is compelled to touch the impurities of the world.

[The *New Dispensation,* 14 October 1881]

THE vulture, says the Paramhansa, soars high, but its heart is where the putrid carcass lies. So the carnal man may soar ever so high in imagination; his heart still grovels in the mire of impurity and filth.

[সুলভ সমাচার, ১৪ কার্ত্তিক ১২৮৮; ২৯ অক্টোবর ১৮৮১]

সাপ্তাহিক সংবাদ।—সেদিন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় কথায় কথায় বলিলেন, শকুনী এবং নীতিবিহীন পণ্ডিতেরা সমান। শকুনীরা আকাশের খুব উচ্চ স্থানে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীর কোথায় কোন্ ভাগাড়ে বা শ্মশানে মরা গরু বা মানুষ পড়িল তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করে, এবং একটি মড়া দেখিতে পাইলেই অমনি নামিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়ে। নীতি ও ধর্ম্মহীন পণ্ডিতেরা জ্ঞানাকাশের খুব উচ্চ স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান কিন্তু সেখানেও তাঁহাদের দৃষ্টি সংসারের পাপের প্রতি স্থির থাকে। একটি পাপ ও প্রলোভন আসিলেই মনের সাধে পাপরূপ পচা মড়া খাইয়া আপনাদের ঘৃণিত অবস্থার পরিচয় দেন।

[The *Indian Mirror,* 11 December 1881]

NOTE.—The Paramhansa of Dakshineswar is rousing the spirit of Devotion and spreading the love of God among the educated classes in the city. Last evening there was a devotional festival at the house of Babu Rajendranath Mitter.

[সুলভ সমাচার, ৩ পৌষ ১২৮৮, শনিবার; ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১]

সাপ্তাহিক সংবাদ।—দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মকথা ও কীর্ত্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দু সমাজে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ় গূঢ় ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকট রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপ বুঝাইলেন যে, রামচন্দ্র পরমাত্মাসদৃশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার অনুরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপ লক্ষ্মণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না; যখনই সীতা একটু পাশ দেন তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দর ভাবে বুঝাইলেন; তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লৌহশলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে কিন্তু লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের যেমন কোন বল খাটে না, তদ্রূপ আত্মা কর্দ্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দ্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনাপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়।

[The *New Dispensation,* 8 January 1882]

HOPEFUL SIGNS.—THOSE who have watched the later phases of religious thought and life in Calcutta must have been struck to find how the venerable Paramhansa of Dakhineswar is serving as a marvellous connecting link between the Hindus and the Brahmos of the New Dispensation. There have been a series of religious meetings of late in the houses of respectable Hindus, in which the representatives of the two communities were harmoniously blended together so as to form a unity of thought and devotion, which was alike striking and interesting. The proceedings of these meetings generally embrace hymns and discourses by the Paramhansa, questions and answers, and kirtan of a most enthusiastic character. Ladies of high caste Hindu families congregate behind the *purdah* in the upper veranda, and listen with the deepest interest. Learned pandits, educated youths, orthodox Vaishnavas and yogis gather in numbers, some from curiosity, some for the sake of *Sadhu Sanga* or good company, others for acquiring wisdom and joining the kirtan. We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm —a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience. The effect is wonderful. Theological differences are lost in the surging wave of love and rapture. What this spiritual fusion and loving union may lead to in the end who can divine? The ways of the Lord are past finding out.

[The *New Dispensation,* 26 February 1882]

On Thursday last there was an interesting excursion by a steam launch up the river to Dakhinashwar. The Rev. Joseph Cook, Miss Pigot, and the apostles of the New Dispensation together with a number of our

young men embarked at about 11 o'clock. The revered Paramhansa of Dakshinaswar, as soon as he heard of the arrival of the party, came to the riverside, and was taken on board. He successively went through all the phases of spiritual excitement which characterizes him. Passing through a long interval of unconsciousness he prayed, sang, and discoursed on spiritual subjects. Mr. Cook watched him very closely, and seemed much interested by what he saw. Mr. Cook represented the extreme culture of Christian theology and thought. The Paramhansa represented the extreme culture of Indian Yoga and Bhakti in short the traditional piety of the East. And the apostles of the Brahmo Somaj in bringing together the two proved that they combined both in the all-inclusive harmony of the New Dispensation.

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ ফাল্গুন ১৮০৩ শক; ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮২]

সংবাদ।—...১২ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিতমণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এই সঙ্গে মাননীয়া মিস পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাষ্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাঁহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদায় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশ প্রার্থনা উপদেশ সঙ্গীত সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে প্রার্থনা করেন তাহা অতি জীবন্ত। তাঁহার দেবতা তাঁহাকে কেবলই ধর্ম্মপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ব দু-চারি জন যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাঁহার আশ্চর্য্য ভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন।...

[সুলভ সমাচার, ১৭ বৈশাখ ১২৮৯, শনিবার; ২৯ এপ্রিল ১৮৮২]

সাপ্তাহিক সংবাদ।—সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় তদুপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পরমহংস মহাশয় তথায় যাইয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই এবং সামাধ্যায়ী মহাশয়ও অসন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।...

[The *New Dispensation*, 30 July 1882]

That great devotee the Paramhansa of Dakhineshwar had another long interview with the minister and his friends at Lily Cottage whither he had been invited on 21st instant. The Paramhansa, though he could not be much over forty-two, looked more aged than he did the last time he was seen. His singular merits suffer no diminution, but greater maturity with the progress of time. Simple as a child, yet sensible and shrewd, he loses nothing of the utter inebriation of God's love. He has a strange attraction for every class of Brahmos, who flock to enjoy his communion wherever he goes.

[The *New Dispensation*, 3 September 1882]

TWO GREAT MINDS.—The venerable Paramhansa lately paid a visit to the eminent philanthropist and scholar, Vidyasagar. Why did he call? What earthly or unearthly advantage did that recluse expect from such a visit? The Paramhansa has a passion for great minds? His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate. Now he is off to see a lion. Now his heart is bent on witnessing steam force as it propels a

steam launch up the river. He is impatient to have a look at a cathedral with its prayerful thousands. And as among beasts and things inanimate he would honor the great, so also among the human species. Curiosity alone, deep and impulsive, led the devotee of Dakhineswar to Vidyasagar's house in Calcutta. No prospect of earthly good actuated him.

Eminent sage, said the devotee, I come as a little muddy stream into the vast deep sea ['sagar.']

Yes, replied Vidyasagar, but you must remember, venerated sire; that the sea is full of salt water, and if a fresh water stream mixes with it, it too becomes salt, and loses all its sweetness.

It is not *avidya* sagar, which indeed is to be shunned, but *vidya* sagar that draws me into its welcome waters;—was the rejoinder.

But the sea hath its dangers and perils, said Vidyasagar, and thousands of monsters hide themselves in its treacherous waters.

Are there not pearls in the deep water of the sea? In search of those pearls I am here. The sea is famous for its hidden treasures. Great is your value, Vidyasagar. So said Paramhansa.

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ মাঘ ১৮০৫ শক; ১৪ জানুয়ারি ১৮৮৪]*

অনেকেই জানেন, দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। এক দিন আচার্য্যদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে পরমহংস মহাশয় হঠাৎ কমলকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আচার্য্যদেব নিদ্রিত, পরমহংস মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও অসুস্থতা বৃদ্ধি হইবে ভয়ে কেহই তাঁহাকে জাগ্রৎ করিতে সাহসী হইলেন না; প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া আচার্য্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে লাগিলেন 'যদি তিনি এখন না আসিতে পারেন যে ঘরে তিনি শয়ন

করিয়া আছেন সেই ঘরটি আমায় দেখাইয়া দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই, তাঁহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।' আচার্য্যদেব গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন, পরমহংস মহাশয়ও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন 'ওগো বাবু আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দাও, আমি আর থাকিতে পারি না।' আচার্য্যদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং পরমহংস মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন স্পষ্ট প্রতীতি হইল, দুইটি অশরীরী আত্মা যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদের সম্মিলনে যেন আগুন উঠিল, দুই জনেই শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে কিরূপ গভীর সৎপ্রসঙ্গে ডুবিয়া গেলেন তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন কেবল তাঁহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচার্য্যদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাঁহার পীড়ার কথা হইল না। এ সম্বন্ধে তিনি এই মাত্র বলিলেন যে 'সময়ে সময়ে মালী ভাল বস্‌রাই গোলাপ বৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার মাটি দিয়া তাহা পূর্ব্বমত পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে গাছে খুব ফুল ও তেজ হয়। তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, এ তোমার পীড়া নয়, তুমি মার বস্‌রাই গোলাপ গাছ, মা তোমার গোড়া খুঁড়িয়া দিয়াছেন, কার্য্য সিদ্ধি হইলে আবার পূর্ব্বমত করিয়া দিবেন।' তিনি আরও বলিলেন 'মাকে পাকা রকম পাইতে গেলে, শরীরে এক এক বার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার উপযোগী করিয়া লইবার সময় এক বার খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লন। আমারও একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়া ঘটি ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত আমার যক্ষ্মা হইয়াছে আর বাঁচিব না।' তিনি আরও বলিলেন 'সে-বার যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, নিদ্রা হয় নাই, মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মা যদি কেশব না থাকেন তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিব?' অর্দ্ধ ঘণ্টা কথোপকথন করিয়া আচার্য্যদেবের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। ('সুলভ সমাচার')

[The *Indian Mirror*, 26 July 1884]

The venerable Paramhansa Ram Kissen of Dakhineswar paid a visit to Pandit Sasadhar Tarkachuramani on Friday week last. In the course of conversation the Pandit asked the Paramhansa's opinion about the caste system—whether it ought to be abolished or not. The Paramhansa replied—"when the fruit is ripe it falls from the tree of itself. To wrench the unripe fruit is not good."

[ধর্ম্মপ্রচারক, শ্রাবণ-পূর্ণিমা ১৮০৬ শকাব্দা; ৬ আগষ্ট ১৮৮৪]

মহাত্মা রামকৃষ্ণ।—গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, বনের শোভা বর্দ্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি আদি যে সকল উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণতঃ পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে২ তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাতে২ যায় নাই। লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দ লাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন। মধ্যে২ তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্দ্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার

করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময়২ অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুল শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত হইয়াছিলেন; দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের ভাব চেষ্টা ও চরিত্র বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভা.ব আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুম্ ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? য়হ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? য়হ তো রোটী বনানে কী খেল হ্যায়?' রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে২ চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকাদর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রাণী রাসমণি জাহ্নবীতটে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিলে, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন; ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তি সহ এই অপূর্ব্ব চিন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জল-বিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন, রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে! আর কি সাধক বাহ্য জগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন! রিপুমদমর্দ্দিনী রঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরেই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জ্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন।

অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি আদি সকলে এক একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কালনিবারিণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎপদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তি-সোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, তিনি বিষ্ঠা মূত্র মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উল্লম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্দ্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অচল অটল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া জানিল, বহু দিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল; সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে আবার বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাট-বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল। তাঁহার পাগলামিতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎমাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক এক দিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকারাশিতে

আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন,. আর বলিতেন, মা! আমাকে ভক্তি দেও! আমি ভক্তি ভিন্ন. আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি ভক্তির জন্য প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ ভক্তির মূল্য বুঝে না, জগতের চক্ষু এ ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে না। ভক্তির মাধুরী, ভক্ত তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকটে বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি; যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে২ তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিষ্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত-চলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণব-ধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে, তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনার দ্বারা কামিনী ও কাঞ্চনকে বস্তুতঃই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্ত পাদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি, যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাঁহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায়, যে বহুদিন শাস্ত্র্যাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থ-

বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার আছে। অদ্য স্থানাভাবে তাহা আর প্রকটিত করিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ ১৮০৭ শক; ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৬]

সংবাদ।...আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের অত্যন্ত সঙ্কট রোগ। তাঁহার কণ্ঠনালীর ভিতরে ক্ষত হইয়া বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সময়ে সময়ে রক্ত বমন করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন দুই সের আড়াই সের রক্ত মুখ দিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়াছে। দুই তিন মাস ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়াছেন, সম্প্রতি আর কোন-রূপ চিকিৎসা হইতেছে না। দিন দিনই অবস্থা মন্দ দেখা যাইতেছে। পরলোকের জন্য তাঁহাকে এইক্ষণ বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। কিছু কাল হইতে তিনি কাশীপুরস্থ এক বাগানবাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক সেই বাটীতে অবস্থান করিয়া পরম যত্নে ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রতি মাসে প্রায় দুই শত টাকা তাঁহার সেবা শুশ্রূষাতে ব্যয়িত হইতেছে। পরমহংস মহাশয় স্বীয় যোগ ভক্তিপ্রবণ পবিত্র উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্তে নরনারীর হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সাধুভক্তির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের আচার্য্যদেবের অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। পরমহংসজীও তাঁহার নামে অশ্রুপাত করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ এদেশে নাই। বঙ্গদেশের উপর কি অভিসম্পাত হইয়াছে, ইনিও বুঝি অচিরেই যাত্রা করিবেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ বৈশাখ ১৮০৮ শক; ২৮ এপ্রিল ১৮৮৬]

সংবাদ।—···দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন, ডাক্তারগণ আবার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার আশা দিতেছেন।

['পরিচারিকা,' শ্রাবণ ১২৯৩; জুলাই ১৮৮৬]

পরমহংসের উক্তি

ছোট ছোট কাঠ নদীতে ভাসিয়া আসে, তাহার উপর কোন বস্তু রাখিলে সবশুদ্ধ ডুবিয়া যায়। কিন্তু বড় বড় চকোর কাঠের উপর দুই পাঁচ জন মানুষ বসিয়া থাকে, এবং সেই কাষ্ঠ ভাসিয়া যায়। মহাত্মারা আপনাদিগের মঙ্গল সাধন করেন, এবং অন্য দশ জনেরও মঙ্গল করেন। কিন্তু সামান্য লোক অন্যের ভার লইতে গিয়া আপনারাও ডোবে ও পরকে ডোবায়।

গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানা প্রকারে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদয় ভিতরে ভিতরে এক আধার হইতে আসিতেছে। নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় লোকদের উজ্জ্বল জ্ঞানালোক এক ঈশ্বর হইতে আসিতেছে।

যত দিন গাছ ছোট থাকে তাহার চারি দিকে বেড়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়, নতুবা গো মহিষাদি উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। গাছ বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন থাকে না। সাধনে যখন মন পরিপক্ক হয়, তখন আর সংসারে ভয় থাকে না।

পুস্তক পাঠে কি ভক্তি লাভ হয়?

পঞ্জিকাতে লেখা আছে এত আড়া জল, কিন্তু সমস্ত পঞ্জিকা-খানি পেষণ করিলে এক ফোঁটাও জল বাহির হইবে না।

মানুষের দেহ হাঁড়ি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি জল চাল আলুস্বরূপ। হাঁড়ির ভিতরে জল চাল আলু ইত্যাদি দিয়া তন্নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে যেমন সেই শীতল জল চাল আলু অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হয়, কেহ হাত দিলে হাত দগ্ধ করে, অথচ এই শক্তি জল চাল ইত্যাদির নিজের নয়, অগ্নির, সেইরূপ মানুষের ভিতর ব্রহ্মের শক্তি সঞ্চারিত

হইলেই দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকর হয়। সেই শক্তির অভাব হইলে আর মানুষ দেখিতে শুনিতে ও চিন্তা করিতে পারে না।

অট্টালিকার ছাদের উপরের জল বাঘের মুখাকৃতি নল দিয়া পতিত হয়। সেইরূপ সাধুভক্তদিগের রসনাযোগে যে সকল সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, উহা ঈশ্বর হইতে আইসে, তাঁহাদিগের নিজের কিছুই নয়।

অন্ধকারের ধর্ম্মই ধর্ম্ম, কিন্তু আলোকের ধর্ম্ম যথার্থ নহে। কোন ব্যক্তি জনতাশূন্য মাঠে যদি যুবতী রমণীকে দেখিতে পাইয়া কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া তাহার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। পরন্তু যে ব্যক্তি কেবল প্রকাশ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে যথার্থ ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে না।

তিরোভাবের অব্যবহিত পরে

['পরিচারিকা,' ভাদ্র ১২৯৩; আগষ্ট ১৮৮৬]

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।—গত বারের পরিচারিকায় আমরা পরমহংসের উক্তি শীর্ষক যে কয়েকটি সার কথা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি। এই সাধু পুরুষ এইক্ষণ আর ইহলোকে নাই। তিনি গত ৩১শে শ্রাবণ নশ্বর মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ঘোর বিলাসিতা নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার মধ্যে ইঁহার পবিত্র জীবন মুমুক্ষু নরনারীর আশাস্থল ছিল। হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথম যৌবনে কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী-তীরে বটমূলে আট বৎসর কাল ক্রমাগত কঠোর সাধনা করিয়া ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন, তীক্ষ্ম বৈরাগ্যের অগ্নিতে মনের সমুদয় কামনা ও আসক্তিকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলেন, গভীর যোগ সমাধি ও ভক্তির মত্ততা স্বীয় জীবনে আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করেন। তাঁহার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় বৈরাগী পরম যোগী ও ভক্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মত্ত থাকিতেন। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ মাত্র প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিতেন। হাসিতেন কাঁদিতেন নৃত্য করিতেন, তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় সরল ছিল। তিনি লেখা পড়া জানিতেন না, অথচ প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য ঈশ্বরদর্শন শ্রবণ বিষয়ে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিতেও গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন. তদ্রূপ অন্য কেহই বলিতে জানে না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল সংসারার্ণবে ঈদৃশ সাধুজীবন আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এরূপ জীবন্ত পুরুষকে দেখিলে আশা হয়, ভয় ভাবনা চলিয়া যায়। আমরা অনেক যোগী ঋষির চরিত্র, বুদ্ধ চৈতন্য নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের বৃত্তান্ত কেবল পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রামকৃষ্ণকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও অনেক দিন তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি, এবং অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার বাক্যে এমন মধুরতা ও চরিত্রে

স্বগীয় আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার নিকট বসিলে আর কাহার উঠিতে ইচ্ছা হইত না। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নানা দূরদেশ হইতে স্ত্রী পুরুষ আগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট লোকের ভিড় হইত। তিনি বিনয়ীর চূড়ান্ত ছিলেন। কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নমস্কার করিতেন, তিনি নারী-জাতিতে ঈশ্বরের মাতৃরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। স্ত্রীকে তিনি জীবনে কখন শারীরিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বীয় ভার্য্যার সঙ্গে জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন। এম. এ., বি. এ. উপাধিধারী অনেক সুশিক্ষিত যুবক তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

তিনি বহুকাল লোকের নিকট এক প্রকার অপরিচিত ছিলেন। কলিকাতার প্রান্তস্থ দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই নির্জ্জনে স্থিতি করিতেন, আপনার ভাবে আপনি মত্ত থাকিতেন, রাজধানীর লোকেরা তাঁহার সমাচার বড় রাখিত না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন লোকসমাজে তাঁহাকে প্রকাশিত করেন। আচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন ও তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন, রামকৃষ্ণও কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। দুই সাধুর হৃদয়ে হৃদয়ে গূঢ় যোগ ও সম্মিলন হইল। ইনি সময়ে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট বন্ধুবর্গ সহ যাইতেন। উনিও কখন কখন কমল কুটীরে উপস্থিত হইতেন। ইঁহারা মিলিয়া নানা প্রকার গভীর কথা বলিতেন, ঈশ্বরপ্রসঙ্গের মত্ততা ও ভাবে ঢলাঢলি ও গলাগলি হইত। আচার্য্যদেব পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য পত্রিকায় ও পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করেন, সেই হইতেই সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হন। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে বেলঘরিয়ার উদ্যানে আচার্য্যদেবের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তদবধি উভয়ের পরস্পর গাঢ় যোগ হইয়া উঠে, উভয়ে পরস্পর সাধুগুণ আদান প্রদান করেন। আচার্য্য পরমহংসের জীবনে পরমহংসও আচার্য্যের জীবনে বিশেষ উপকৃত হন। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়। পরমহংসদেব সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা করিতেন, এবং ঈশ্বরকে মা নামে সম্বোধন করিয়া মত্ত হইতেন। সমাধির অবস্থায় তাঁহার বাহ্য চেতনা থাকিত না, মুখে সুমধুর হাসি, নেত্রযুগল

স্পন্দহীন, তাহা হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত, সর্ব্বাঙ্গ কাষ্ঠ প্রস্তরবৎ স্থির নিশ্চল হইয়া যাইত। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের নূতন নূতন চমৎকার কথা, যোগ ভক্তি বৈরাগ্যের গভীর তত্ত্বসকল বলিতেন। তাঁহার কথায় অত্যন্ত মিষ্টতা ও আকর্ষণ ছিল, তাঁহার নিকট বসিলে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকিত না। তাঁহার কথা শুনিলে ও স্বর্গীয় ভাব দেখিলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত ও পাষণ্ড বিদলিত হইত। তিনি অতি মধুর সঙ্গীত করিতেন। তিনি হরি বলিতেন কালীও বলিতেন এবং আপন উপাস্যকে সচ্চিদানন্দও বলিতেন। কখন কখন মা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার গভীর ভাব সাধারণ লোকের বুঝা দুঃসাধ্য ছিল, যিনি বুঝিয়াছিলেন তিনি তাঁহার তিন বৎসর পূর্ব্বে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে উভয়ে স্বর্গলোকে প্রেমে মাতামাতি করিতেছেন। এরূপ সাধু লোকের আবির্ভাবে দেশ পবিত্র হয়, দর্শনে পুণ্য হয়। পরমহংসদেব আচার্য্যদেবের সমবয়স্ক ছিলেন, ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এবারও আমরা তাঁহার কতকগুলি উক্তি প্রশ্নোত্তর-রূপে পাঠিকাদিগের পাঠের জন্য এ স্থানে প্রদান করিলাম।

উক্তি

প্রেম ভক্তি কিরূপে স্থায়ী হয়?

জলপূর্ণ কলস ঘরে সিকার উপর তুলিয়া রাখিলে কিছু দিন পর সেই কলসের জল শুকাইয়া যায়, কলসকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখ তাহার জল কখন শুষ্ক হইবে না। তদ্রূপ প্রেমময় ঈশ্বরের সত্তায় যে আত্মা নিমগ্ন তাহার প্রেম কখন শুষ্ক হয় না। একদিন প্রেম ভক্তি লাভ হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সিকে তোলা জলের ন্যায় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

গুয়ে মাছি কখন ময়রার দোকানে মিষ্টান্নের উপর যাইয়া বসে, আবার কোন মেথরাণী নিকট দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইতে সেই গন্ধ পাইয়া মিষ্টান্ন ছাড়িয়া বিষ্ঠায় যাইয়া বসে, কিন্তু মৌমাছি মধুপানেই মত্ত থাকে। এইরূপ সংসারাসক্ত মন স্থির হইয়া ঈশ্বরের প্রেম মধু

পান করিতে পারে না, বার বার সংসারের দিকে পাপের দিকে দৌড়ে যায়। ভক্ত হরিপাদপদ্মমধুপানে মগ্ন থাকেন। ঘোর বিষয়ীর মন গোবরে-পোকার ন্যায়; গোবরে-পোকা গোবরের ভিতরে থাকে, গোবর ছাড়া তার অন্য কিছুই ভাল লাগে না, পদ্মের ভিতর জোর করিয়া বসাইয়া দাও সে ছট্‌ফট্‌ করিবে। সেইরূপ বিষয়ী মন বিষয় ছাড়া ধর্ম্মের দিকে কখন যায় না। ধর্ম্মচর্চ্চায় ছট্‌ফট্‌ করে।

সাধনের কিরূপ অবস্থা?

পক্ষিগতি বানরগতি ও পিপীলিকাগতি এই ত্রিবিধ গতির ন্যায় সাধনের ত্রিবিধ অবস্থা। পক্ষী গাছে বসিয়া একটি ফল ঠোকরাইল, ফলটি হয়ত পড়িয়া গেল, সে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। বানর ফল মুখে করিয়া লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে তাহা পড়িয়া গেল, কিন্তু পিঁপড়ে ধীরে ধীরে তাহার খাদ্যবস্তুর দিকে গেল, এবং সেই খাদ্যবস্তু মুখে করিয়া আস্তে আস্তে লইয়া আসিল, কিছুতেই সে ছাড়িল না, ক্রমশঃ তাহা ভোগ করিতে লাগিল। এই পিপীলিকা-গতির ন্যায় সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন, নিশ্চয় লাভ করা ও ভোগ করা চাই। চঞ্চলভাবে সাধন করিয়া কেহ জীবনের সম্বল সঞ্চয় করিতে পারে না।

সংসার কিরূপ?

সংসার লাল চুসিমের মত, লাল চুসিম কঠিন কাষ্ঠখণ্ড, তাহাতে কোন রস নাই, কিন্তু শিশু রাঙ্গা দেখিয়া আনন্দে তাহা চুসিতে থাকে, মা সময় সময় আসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া যান। সেইরূপ অজ্ঞান লোকেরা বাহ্য চাকচিক্যশালী নীরস সংসার লইয়া ভুলিয়া থাকে। পরম মাতার প্রেম-দুগ্ধ ভিন্ন সংসারে তাহার আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি লোক নূতন দল করিল, দল করা কি ভাল?

পরিষ্কার জলে পাটা হয়, তাতে জল পরিষ্কার থাকে ও গুড়ের গাদ কাটে, পচা জলেই দল-পানা হয় ও জলকে পচায়। প্রেমের স্রোত বন্ধ হইয়া মন পচিলেই লোক দল করে ও অন্যকে পচায়, নির্ম্মল হৃদয় অন্যের মনের ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকে।

বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা কি ঠিক?

আত্মা উন্নত হইলে নারিকেল গাছের বাল্‌দের ন্যায় আপনিই পৈতে পড়ে যায়, তাহা ফেলিবার জন্য আর চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না।

এখন যে লোক ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, তাহা কিরূপ মনে করেন?

দুই শত লোকের সঞ্চয়, হাজার লোকের নিমন্ত্রণ, অল্প সাধনে গুরুগিরি ও প্রচার।

যারা ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা বলে, তাদের কাজ কেন সেরূপ নয়?

"নাক্ তেরে কেটে তাক্" বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। যেমন হাতীর দাঁত বাহিরে এক প্রকার ভিতরে অন্য প্রকার, কপট ধার্ম্মিকের অবস্থা এইরূপ।

সাধু মহাজনদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরস্থ লোকদিগের নিকটে তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি?

বাজিকরের বাজি তাদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা দেখে না। দূরের লোকে বোকা হয়ে দেখে। বজ্রবাটুলের বীজ গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায় গাছ হয়। সেইরূপ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচার দূরেতেই কার্য্যকর হয়।

কোথায় সাধন করা চাই?

সাধন হয় কোণে বনে মনে।

নির্লিপ্ত সংসারী কিরূপ?

যেমন পদ্মপত্রে জল ও পঙ্কলিপ্ত মদ্‌গুর।

ইঁহার অন্তরে কত ভাব খেলিতেছে, অথচ এরূপ গম্ভীরভাবে আছেন কিরূপে?

একটা হাতী ছোট ডোবায় নামিলে সেই ডোবা উথলে পড়ে, দীঘিতে দশটা নামিলেও কিছুই হয় না। তাঁহার আত্মা বৃহৎ সরোবরের ন্যায় গভীর।

এক এক বার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন?

বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখতে হয়। সাধন চাই।

অন্নের ভাবনা ভাবতে হয়, সাধন ভজন করি কিরূপে?

যাঁর জন্য খাটবে তিনিই খেতে দিবেন, যিনি পাঠায়েছেন তিনি আগেই খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আমিত্ব কি সম্পূর্ণ দূর হইবে না?

পদ্মের পাপড়ি খসে যায়, কিন্তু তার দাগ যায় না। আমিত্ব যায়, কিন্তু একটু দাগ থাকে।

সমাধির অবস্থায় কিরূপ সুখ?

সমুদ্রের কাত্‌লা মাছ পুনরায় সমুদ্রে পড়িলে তাহার যেরূপ সুখ হয় সেই প্রকার সুখ।

মনুষ্যের দেবত্ব কতক্ষণ থাকে?

লোহ যতক্ষণ আগুনে থাকে ততক্ষণই লাল। আগুন হইতে বাহির করিলেই কাল। ঈশ্বরের সঙ্গে যতক্ষণ যোগ ততক্ষণই মনুষ্যের দেবত্ব।

তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা কি আবশ্যক?

তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পান।

প্রথম কিরূপ সাধন করিতে হয়?

প্রথমে হাঁড়ি-কলসী লিখতে হয়, শিখা হ'লে আর লিখতে হয় না। প্রথম সামান্য সামান্য বিষয়ের সাধন হয়।

ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন?

আকাশের জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, যেমন ছাদ ও যেমন নল দিয়া বাহির হয় সেইরূপ ঘোলা বা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

সংসারের সাধন করিতে কি সম্বল চাই?

শব সাধন করিতে যেমন কড়াই মুড়কি চাই, শবটা জীবিত হয়ে হাঁ ক'রে উঠলে তার মুখে কড়াই মুড়কি দিতে হয়। সেইরূপ সংসারের জন্য টাকা পয়সারূপ কড়াই মুড়কি চাই।

মানবীয় ভাব কেমন ক'রে যায়?

ফল বড় হ'লে ফুল আপনি উড়ে যায়। দেবত্বের প্রভাব বাড়িলে নরত্ব থাকে না।

জীবাত্মা পরমাত্মায় যোগের অবস্থা কিরূপ?

ঘড়ির ছোট ও বড় কাঁটা দুপুরের সময় যেমন এক হয়ে যায় সেইরূপ।

শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?

মানুষ হাড়ের ঘরকন্না করে, সেই দেহরূপ হাড়ের ঘরখানা কেবল পুঁজ রক্ত মলমূত্রের আধার, এ সকল ভাবিলে তাহার প্রতি আর আসক্তি থাকে না।

ভক্ত কেন ভগবানের জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে দেন?

পতঙ্গ একবার আলো দেখিলে আর অন্ধকারে যায় না। পিঁপড়া গুড়ে প্রাণ দেয় তবু ফেরে না। ভক্ত ঐরূপ।

মা বলিতে ভক্ত এত মত্ত কেন হন?

মা'র কাছে যে আব্দার বেশী।

বৈরাগ্যাশ্রয় কিরূপে করিতে হয়?

স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, আমার দাদা সন্ন্যাসী হবেন, তিনি অনেক দিন হইতে কিছু কিছু ক'রে তাহার যোগাড় করিতেছেন। স্বামী বলিলেন, দূর ক্ষেপী, সে কখন সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। আয়োজন উদ্যোগ করিয়া কোন দিন বৈরাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। স্ত্রী বলিলেন, তবে কেমন করিয়া হয়? স্বামী বলিলেন, দেখ্‌বি কিরূপে হয়? এই বলিয়া তিনি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিলেন, তৎক্ষণাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

বৈরাগ্য কয় প্রকার?

মোটামুটি দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য ও মেদাটে বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য রাতারাতি খাল কেটে পুকুরে জল আনয়নের ন্যায়। মেদাটে বৈরাগ্য হচ্ছে-হবে, তাহা কোন দিন ঠিক হইয়া উঠে না।

সাধকের কোনরূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?

ভেক ধারণ ভাল, গৈরিক পরিধান করিলে ও খোল করতাল লইলে মুখে খেয়াল টপ্‌পা আইসে না। কালপেড়ে ধুতি প'রে চুল বাঁকিয়ে ছড়ি হাতে ক'রে বাহির হইলেই নিধুর টপ্‌পা গাইতে ইচ্ছা হয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিরূপ মনে করেন?

তাঁহারা শকুনির ন্যায়, শকুনি অনেক ঊর্দ্ধে উঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক উচ্চ কথা বলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের ফলার ও দক্ষিণার দিকে তাঁদের লক্ষ্য।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা ভাদ্র ১৮০৮ শক; ১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬]

সংবাদ।—···আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে লিখিতেছি যে, পরমযোগী ও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের ভক্তিভাজন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গতকল্য রাত্রি ১০ ঘটিকার* সময় কাশীপুরে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল হইতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, এইক্ষণ সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। বঙ্গভূমি একটি সাধুরত্ন হারাইল। অদ্য অপরাহ্ণ ৫টার সময় বরাহনগরের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।

[The *Indian Mirror*, 19 August 1886]

THE LATE RAMAKRISHNA PARAMAHANSA.—The much respected Ramakrishna Paramahansa of Dakhineswar who was ailing for some months past from scrofula, breathed his last at about 1 A.M. on Sunday, the 15th instant. The disease had gradually undermined his health, but it was not expected that the end would come so soon. On the day in question, he had taken his evening meal, and had, as usual, retired to bed. A song which was being sung by some of his attendants awoke him and he joined with them, but a short while after they did not hear his voice, and thought that he had as was his wont gone into ecstasy

* এই সংবাদে তিরোভাবের সময় ভুলক্রমে রাত্রি ১০ ঘটিকা দেওয়া হইয়াছে। আসলে পরমহংসদেব রাত্রি ১টার অব্যবহিত পরে দেহরক্ষা করেন। ইহাতে ইংরেজী-মতে তারিখ ১৬ই আগষ্ট হয়। বাংলা তারিখ ৩১এ শ্রাবণই থাকে।

(Samadhi). As, however, he continued in this state for a somewhat longer time than usual, they touched his body and felt his pulse, when it was found that he had ceased to breathe and was no longer living. The very evening he had asked one of the medical men, who visited him, whether his disease was a curable one, but having received no satisfactory reply he was heard to say that he was prepared to die any moment.

The next evening his body was removed to the burning *ghat* at Cossipore. The funeral procession was followed by a large number of his followers, friends and admirers who had hastened to the spot to have a last look at his face. The party entered the *ghat,* chanting hymns in praise of Hari. The cot containing the body was then laid down on the side of the river and all the men sat down on the bare ground, forming a circle around the dead body. Babu Troylokhya Nath Sanyal the singing minister of the Brahmos, sang a few songs suited to the occasion. After the songs had softened to some extent the hearts of the sorrowing multitude, the body was placed on the funeral pyre and in an hour and a half the burning was complete. A few bones only were taken to be interred at a suitable spot.

Ramakrishna began life as a priest in one of the shrines at Dakhineswar. Here he practised devotion, yoga and austerities, such as is customary with Hindu devotees. The outcome of all this was a religion which is as liberal as possible. Ramakrishna combined in his own person a Hindu, a Mohammedan and a Christian In fact, he made no distinction of castes and creeds and his constant wish was that the followers of all religions, being freed from mutual jealousies, would all unite in brotherly love, and sing in praise of the Almighty. He was an unlettered man, but his commonsense was strong and his power of observation keen. He had facility for expressing his ideas

in such homely language that he could make himself easily understood by all on intricate points of religion and morality. His childlike simplicity and outspokenness, his deep religious fervour and self-denial, his genial and sympathetic nature and his meek and unassuming manners won the hearts of those who came in contact with him, and music from his lips had a peculiar charm on those who heard him sing. Among others the late Babu Keshab Chandra Sen was very fond of his company and used to spend hours with him in religious conversation. The most remarkable feature in his life was that he succeeded in reforming the character of some young men whose morals were very corrupt. Graduates and undergraduates vied with one another in becoming his followers and many of them have already renounced the world and have adopted the life of ascetics. During the last few months of his illness, it was a touching scene to see the tender care and love with which these young men attended him day and night. Now that he is no more, may the spirit of love and kindness and the high moral tone which he has imparted last for ever, and bear golden fruits.

[The *Indian Mirror,* 21 August 1886]

Ramkrishna Bhuttacharji, better known in the Hindu community as Paramahamsa of Dakhineswar, was born on the 10th of Falgoon, 1834, at Sripore Kamar Puker in the District of Burdwan. His father Khuderam Bhuttacharji, was a devout Brahmin and in all respects a true Hindu. On the young Ramakrishna the qualities of his parents must have exercised more than usual influence. A peculiarly religious temper seems to have taken powerful hold of his mind and it continued the ruling principle through life. In his 12th year he came to Calcutta with his eldest

brother Rameswar Bhuttacharji and lived in Jhamapukur, where the latter founded a *chutushpaty* or a school for Brahminical learning. Here Paramahamsa continued his studies in Sanskrit for some time. Paramahamsa always deprecated Brahminical learning which, he said, instead of making a man religious, only secured him an oblation of rice and plantain. But though not distinguished for scholarship, Paramahamsa had a gift of strong commonsense and quick apprehension. He could argue learnedly with the most erudite Pandits of the day and understand and explain the most abstruse passages of the Sanskrit scripture. In 1852 the stupendous temples of Dakshineswar were founded by the late Rani Rashmoni. Paramahamsa's eldest brother Rameswar Bhuttacharji was appointed priest of the temple of Kali. After his death Paramahamsa succeeded to his office. He did not hold it for a long time, but resigned it for higher devotional exercises. The acquaintance which he here formed with Hindu ascetics of various denominations, seems to have caused a considerable diversion in his religious opinions. The teachings of these Yogis had an abiding effect on his whole life. From this time he secluded himself entirely from the world and passed his days in prayer and contemplation in an obscure corner on the riverside of the temple garden. This place known as Panchvati is held in sacred veneration by many of his followers. Here

"Remote from man, with
God he passed his days
Prayer all his business, all his
Pleasure praise."

The great doctrine of his religion was renouncement of Kamini-Kanchan, that is, humanities and wealth. The late Paramahamsa was held in the highest respect by all sections of Hindu community. The educated Hindus appreciated his teachings highly and

among his followers were many graduates and undergraduates of the University. The great Brahmo leader, the late Babu Keshab Chandra Sen had a profound love and respect for him. If faith, love, self-sacrifice, purity of character and entire resignation to the will of the Almighty be the chief qualifications of a religious man, they found their highest perfection in him and the veneration of the people was not misplaced. (Reprinted from the *Englishman.*)

[The *Indian Mirror,* 10 September 1886]

With the exception of a few people in and around the city, Paramahamsa Ramakrishna was not much known in the country. But he was a devotee of the true type. Born of a poor Brahmin family in Jahanabad in the Hooghly district, Ramakrishna was not fortunate in receiving a good education, secular or spiritual, in his younger days. When he grew up to be a man, his brother, who was a priest, brought him down to Calcutta to relieve him of his priestly duties, but Ramakrishna was averse to this as he always entertained a feeling of intense hatred towards the so-called Brahmin priests. A few years after, his brother died and he was induced by his friends and relations to fill the place of his brother for the support of his family, which he did with great reluctance. At last, Ramakrishna was relieved by a nephew of his, and he commenced to pave the path for his journey to the happy land. Days and nights, weeks and months, he passed on the banks of the holy Ganges, meditating and communing with the supreme being whom he styled by the name Divine Mother. Ramakrishna's divine exercises became gradually so strong that when he performed it he used to lose all external sensibility. I had the good fortune of seeing him and conversing with him many a time, and I had been out of humour

to see him performing the exercises when his body used to become void of animation. Anyone who touched at that time his body, found it to be as stiff as a plank. Mr. Cooke, the American evangelist, who came to this country a few years ago, once witnessed Ramakrishna's divine exercises and he expressed his great surprise at it and remarked that he was not aware before that a man could become so much immersed in divine spirit as to lose all perception of the external world. It is about ten or twelve years since the late Babu Keshab Chandra Sen found Ramakrishna out, and from that time he came to be known to some persons. *Ramakrishna was very fond of Keshab Chandra Sen and before his death, he expressed his desire to pass the remaining days of his life in the sanctuary at the Lily Cottage, the residence of the departed Brahmo leader.* Ramakrishna in his habits was simple and unassuming. He had a peculiar facility in expressing deep spiritual truths in homely and impressive language. All sections of the community mourn his loss. The other day his ashes were buried in the garden house of one of his disciples, on which occasion hundreds of educated persons were present. A procession of several graduates and undergraduates of our University was formed when the ashes were conveyed to the garden house.

[সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ১২ই ভাদ্র ১২৯৩;

২৭এ আগষ্ট ১৮৮৬]

···আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা নিম্নে অবিকল লিখিলাম।

গত সোমবার [২৩ আগষ্ট ১৮৮৬] প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সংকীর্ত্তন সহ অনেক-গুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্র কলস

লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন, দলে অনুমান পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল করতাল সিঙ্গা সহ বিডন ষ্ট্রীট থিয়েটারের কয়েক জন অভিনেতার একটি সংকীর্ত্তনের দল তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নব রচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন, পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন, ফুলের মালায় কলসীটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানী যোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুই দিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্ব্ব পশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত মস্তকে গমন করিতেছিলেন। সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পঁহুছিয়া একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধিগহ্বরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণ পূর্ব্বক অনেকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিলেন, উদ্যানটি পত্র পুষ্প ও সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু যদুনাথ মিত্রের উদ্যানে উৎসব হইল।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ ভাদ্র ১৮০৮ শক; ৩১ আগষ্ট ১৮৮৬]

সংবাদ।—ভাদ্রোৎসবের [৭ই ভাদ্র] পূর্ব্ব...বৃহস্পতিবার দিন মন্দিরে সন্ধ্যার পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল স্বর্গগত পরমহংসের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে দিন দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্ণে ৭টা হইতে পরমহংস সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। প্রেরিতবর্গ সকলে বিনামাবর্জ্জন ও হবিষ্যান্ন করিয়া বিশেষভাবে সেই দিন যাপন করিয়াছিলেন।

১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপাল বাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহনগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে এক শত, দেড় শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাটখানা বেশ সাজান হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তি-সহকারে পদধারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যানপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন, এক দল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ

করতাল সহ সংকীর্ত্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু, বাবু রাজমোহন বসু ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই চারি জন বিধানপ্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বুদ্ধধর্ম্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্ব্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ঘাটে খট্টা স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন হয়। পরে সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩।৪টী সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মীলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধ হয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্ব্ব দিন রাত্রি দশটার সময় তিনি বলিয়াছিলেন আমার নাভিশ্বাস হইল যে, তৎপর তিন বার কালী নাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন, তাহাতেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও চন্দন-কাষ্ঠ সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত অগ্নি তাঁহার পবিত্র দেহকে গ্রাস করে। তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্ম্ম-পিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবকের সাধু-ভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য কেহ কেহ পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেক প্রেরিত সেই দিন হইতে ৩।৪ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ৯ই সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে পরমহংসের দেহভস্ম মহাসমারোহে প্রোথিত হইয়াছে। সে স্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহুসংখ্যক ভদ্র সন্তান্ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কাশীপুর হইতে ভস্ম সেখানে

লইয়া যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাঁহারা খেচরান্নাদি ভক্ষণ করেন। শুনিলাম প্রায় ৭ শত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অপর ২।৩ জন প্রচারক এবং কতিপয় বিধানবাদী ব্রাহ্ম সেই সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পরমহংসের উক্তি পুস্তক পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম, রামচন্দ্র বাবু না কি স্বীয় উদ্যান পরমহংসদেবের নামে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ ও কীর্ত্তির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

পরমহংসদেব সময়ে সময়ে যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আচার্য্যদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি নূতন উক্তি তৎসঙ্গে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাম, "পরমহংসের উক্তি," মূল্য ৵১০ পয়সা মাত্র। সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার তাঁহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই ভাদ্র ১৮০৮ শক; ৩১এ আগষ্ট ১৮৮৬]

স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংস।

আমাদের দেশের কি দুর্ভাগ্য উপস্থিত? ক্রমে ক্রমে পুণ্যাত্মা সাধু মহাপুরুষ সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমদ্দাচার্য্যদেবের তিরোধানের [৮ জানুয়ারি ১৮৮৪] পরই তাঁহার সঙ্গে যে কয়জন সাধুর জীবনের গূঢ় যোগ ও সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা একে একে তিরোহিত হইলেন। ডোমরাওঁয়ের শিখগুরু নাগাজি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তৎপর গাজিপুরের গর্ত্তশায়ী পবনাহারী বাবা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, আচার্য্যের তিরোধানের অব্যবহিত সময়েই হলদিবাড়ীর নাগাসন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। যাঁহার সঙ্গে আচার্য্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ ও বন্ধুতা ছিল, যিনি বিধানের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই সাধুরত্ন মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গত বারে আমরা তাঁহার স্বর্গারোহণের সংবাদমাত্র প্রদান করিয়াছি, এবার

তাঁহার জীবনের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। সাধু-চরিত্রের মাহাত্ম্য সাধু ভিন্ন অন্য লোকে অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং যথাযথ বর্ণনা করিতেও সক্ষম হয় না। আজ আচার্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলে পরমহংসের জীবনের সৌন্দর্য্য ও গূঢ় গভীর ভাব লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেন, সেরূপ আর তাঁহার জীবন কে বুঝিতে পারিয়াছে যে লিখিতে পারিবে? তবে আমরা আচার্য্য-দেবের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পরমহংসদেবের সহবাস করিয়া আচার্য্যের প্রভাবে ও ঈশ্বরকরুণায় যতটা বুঝিতে পারিয়াছি ও তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যত দূর অবগত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি জিলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গত ৩১এ শ্রাবণ রবিবার রাত্রিতে তিনি ঐহিক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পাঁচ মাস ২০ দিন হইয়াছিল। কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগে তিনি বৎসরাধিক কাল ক্লেশ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমহংসদেবের পিতার নাম ক্ষুধিরাম ভট্টাচার্য্য, তিনি একজন সাধক যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১০।১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই রামকৃষ্ণের অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন স্থানে যোগী সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করিতেন, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া পরিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন পৌরাণিক অনেক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠক-দিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি-শক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখন ভুলিতেন না। ধর্ম্মের সুকঠিন জটিল বিষয় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। শ্রুত হইল, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পৌরোহিত্য করিতে হইবে বলিয়াই, তিনি তাহা হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণ কিছু কাল জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। যখন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহপূর্ব্বক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু রামকৃষ্ণের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে মথুর বাবু তাঁহাকে কালীদেবীর মন্দিরে পূজা ও পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ এই ভাবে কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে অবস্থিতি করেন। পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজাইতেন ও দেবালয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এক দিন তিনি কালীপূজা করিতে বসিয়া পুষ্প চন্দনাদি বিগ্রহের মস্তকে অর্পণ না করিয়া নিজের মস্তকে স্থাপন করেন। কখন কখন তিনি কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুর বাবুর ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে থাকেন। তদবধি নবযুবক রামকৃষ্ণ রিপুদমন ও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। উক্ত দেবালয়ের সন্নিহিত ভাগীরথীতীরে পঞ্চবটীমূলে তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র। ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্রাদিবিহিত নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করেন নাই। আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া রিপুদমন, বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যোগসাধন ঈশ্বরদর্শনের জন্য নানা পন্থা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখন নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন, কখন প্যাঁজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ করিয়াছেন, কখন বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনুমান সাজিয়া রাম রাম বলিয়াছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর তাঁহাকে রীতিমত নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার শরীরে এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শীতকালের রজনীতেও তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দ্দন করিতে হইত। অনেক দিন তিনি সূর্য্যাস্ত গমনকালে ভাগীরথীতীরে বসিয়া মা, দিন তো

চলিয়া গেল, কিছুই যে হইল না, এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেন। ইদানীং কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরলাভের উপায় কি? তিনি বলিলেন যে, ব্যাকুলতাই তাহার উপায়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ব্যাকুলতার সঞ্চার হয় না। এক সময় আমার উপরে ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়াছিল। প্রথম হইতে তিনি কামিনী কাঞ্চনকে ঈশ্বর-পথের প্রবল শত্রু জানিয়া এই দুইয়ের ঘোর বিরোধী হন। কঠোর সাধনাবলে কামিনী কাঞ্চনের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। কামিনীর উপর জয়লাভ করিবার জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছেন, স্বয়ং অলংকার পরিধান করিয়া স্ত্রী সাজিয়া সাধন করিয়াছেন। নারীমাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাঁহাদের মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার ভার্য্যার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। স্ত্রীর নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিক ভাবে সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহু কাল পরে পত্নীকে নিকটে আশ্রয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় থাকিতেন। রামকৃষ্ণ সাধনের অবস্থায় টাকা মাটী, টাকা মাটী বলিয়া টাকা গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। মথুর বাবুর প্রদত্ত ভাল ভাল বস্ত্র ও শাল দোশালা ছিল, তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করেন, কতকগুলির মধ্যে থুথু দিয়া মাটী মাখিয়া লোকদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে এরূপ অবস্থা হয় যে, টাকা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। এক দিনও তিনি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করেন নাই, কখন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। একদা একজন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছু কাল কথোপকথনের পর পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হয় দেখিতেছি, আমি কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার সুদে আপনার

নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "দুঃ শ্যালা।" তাহাতে বড় লোকটির মুখ চূণ হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এইরূপ নিঃসম্বল বৈরাগী পুরুষের পীড়ার অবস্থায় চিকিৎসাদির জন্য প্রায় বৎসরাবধি কাল প্রতি মাসে দেড় শত দুই শত টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। প্রায় এক শত টাকা ভাড়া করিয়া কাশীপুরে সুন্দর বাগান বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? ৮ বৎসর পর রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন. তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ ও সমাধির ভাব, তেমন ভক্তির মত্ততা প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন. কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন. কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এ সমুদয় লক্ষণই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত. পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস, ভক্তির মত্ততা, অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তযোগে অতি সুন্দর সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল

প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা, সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্যশূন্য সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃৎপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত। তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভ্যতা জানিতেন না। অনেক সময় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মচর্চ্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা সাকার নিরাকার মিশ্রিত ছিল। তিনি কালী ও মা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন ও মত্ত হইতেন। জিজ্ঞাসা মতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি হস্তনির্ম্মিত খড় ও মাটীর কালী মানি না, আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দ। যাহা বৃহৎ ও গভীর তাহাই কাল বর্ণ, সুবিস্তৃত আকাশ কাল বর্ণ, সুগভীর সমুদ্র কাল বর্ণ। আমার কালী অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী চিদ্রূপিণী। তিনি মূর্ত্তি পূজা করিতেন না। পরমহংসদেব এক দিন পথ দিয়া যাইতে এক জন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন. এবং বলেন "আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন. তাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে। তাঁহার যেমন শাক্ত ভাব তেমনি বৈষ্ণব ভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তাঁহাতে যোগ ভক্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন ছিল. তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন. নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগসমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সমুদায় তাঁহাতে পূর্ণভাবে লক্ষিত হইয়াছে। সাধনার প্রথম হইতে তাঁহার জীবনে ধর্ম্মসমন্বয় ও নববিধানের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। সেই উদার ভাবের ভাবুক না হইলে কি তিনি কখন প্যাঁজ খাইয়া আল্লা নাম জপ করিতেন? তিনি যে গৃহে বাস করিতেন. গৌর নিত্যানন্দ

ইত্যাদির ছবির সঙ্গে যিশুখৃীষ্টের ছবিও প্রাচীরে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, তাঁহাকে অনেক সময় কাল পেড়ে ধুতি পরিতে দেখা গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতেন বটে, কখন কখন তাহা জীবনের বন্ধন বলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সাধনার সময় হইতে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বহু বৎসর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তিনি খাওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরাইতেন, উপবীত ফেলিয়া দিলে গলায় পরাইয়া দিতেন। [ক্রমশঃ।]

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শক; ১৬ই সেপ্টম্বর ১৮৮৬]

[গত প্রকাশিতের শেষ]

রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের প্রান্তস্থ ভাগীরথীতীরে একটি একতলা ঘরে অবস্থিতি করিতেন। অন্য কোথাও প্রায় তাঁহার গতিবিধি ছিল না, কদাচিৎ স্বদেশে যাইতেন। পূর্ব্বে একবার মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন, যোগ সমাধি ও ভক্তির মত্ততায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। লোক জন বড় তাঁহার নিকটে যাইত না, প্রায় কাহারও নিকটে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরের গ্রামের লোক তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই জানিত। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য অনুক্ষণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে এক দিন পূর্ব্বাহ্ণে ৮।৯টার সময় পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উদ্যানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তরুতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযমন ও বৈরাগ্যসাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরমহংস, আচার্য্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন

করেন। তখন আচার্য্যদেব বন্ধুবর্গ সহ সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ছেকড়া গাড়ীযোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্য্যদেবকে বলেন যে, আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংসদেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসের পরিধানে একখানা পাড়ওলা ধুতিমাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁন্ধে ফেলিয়াছিলেন। দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ, আমি জানিতে চাহি। এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংস একটি রামপ্রসাদী গান করেন। গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা এই এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, তৎপর প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সে দিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস পরমহংস "গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু সিং দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে স্বজাতি বলিয়া গা চাটাচাটি করে।" "বেঙ্গাচির লেজ খসিয়া পড়িলেই ডাঙ্গায় লাফিয়া বেড়ায়।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। সাধু সাধুকে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়।

সময়ে সময়ে আচার্য্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য্য-ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, আচার্য্য-দেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল লোক আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কত আনন্দের স্রোত ও মত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকা আরোহণে ব্রাহ্মমণ্ডলী সহ আচার্য্য মহাশয় পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন, কখন কখন বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। উৎসবান্তে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা উৎসবের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমহংস দ্বারা আচার্য্যদেব আচার্য্য দ্বারা পরমহংসদেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল, পরমহংসের জীবনে ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও আচার্য্যের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্ম্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন। যখন আচার্য্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্য্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও চরিত্র পুস্তক ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার বিবরণ সকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মগণ তো উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতেন, ব্রাহ্ম ব্যতীত অপর শ্রেণীর নরনারীও দলে দলে গমনাগমন করিতেন। নূতন ধর্ম্ম দান ও সত্য প্রচার বা একটা নূতন মণ্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ আধারে নয়, সে আধারে, অর্থাৎ কেশবচন্দ্রে। কিন্তু পরে অনেক লোককে তিনি সাধন ভজন সম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ দিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবক

অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিলাম, ন্যূনাধিক পাঁচ শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না, এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত পৌরোহিত্য ও গুরু-ব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটী কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্ব্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাত্না ডুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল, সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভিতরে কিল্ বিল্ করছে।" পরমহংসদেবের সেই হইতেই আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যদেব তাঁহাকে কিছুই জানিতেন না। অনেক বৎসর পরে শুভক্ষণে বেলঘরিয়ায় দুইজনের গাঢ় সম্মিলন হয়। তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্ম সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংসদেবের সমুদায় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন। কোন দিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান্ জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন।

সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্ব্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি-বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্যভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারী ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। এক দিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "আমার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ, আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে।" তিনি বলিলেন, "যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টে সৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্যদ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।" আচার্য্য-দেবের শেষ অবস্থায় সংকট পীড়ার সময় পরমহংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুইজনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্ণে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন, মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া "এখানে তিন শত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন।" এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি, পূর্ব্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরমহংস অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন, "কেশব চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলে গিয়াছে। কেশব প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শত

সহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হত, সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারি গাছ তালগাছের মত, শীতল ছায়া দানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।" কিছু দিন হইল, আচার্য্যদেবের একখানা ছবি পরমহংসদেবের গৃহে তাঁহার একজন শিষ্য টাঙ্গাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন, "এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশবচন্দ্রকে দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।" আচার্য্যমাতা ও আচার্য্যপত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদর যত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল, কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দহীন স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধু পুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায়জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। আমরা নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, কাহার নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া

জল হইতে সার ভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার কতকগুলি উক্তি প্রশ্নোত্তরানুসারে লিখিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই উক্তিগুলি পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।—

পরমহংসের উক্তি

[এই শিরোনামায় প্রথমে এই পুস্তকের ৫০-৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উক্তিগুলি প্রায় হুবহু মুদ্রিত হইয়াছে। বাকিগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল]

ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে ধারণ করা যায়?

তাঁহার কৃপাবারি সকল স্থানে বর্ষিত হয়, কিন্তু বিনীত আত্মাতেই কৃপা স্থিতি করে ও কৃপাবারিতে তাহা সরস থাকে, তজ্জন্য সেই আত্মাতে প্রেমভক্তি বিশ্বাসাদি নানা স্বর্গীয় শস্য জন্মে। যেমন আকাশ হইতে সর্ব্বত্র জল বর্ষিত হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে সেই জল দাঁড়ায় না, নিম্ন ভূমিতে দাঁড়ায় ও তাহাকে শস্যশালিনী করে।

আপনি সৎপ্রসঙ্গ ছাড়তে চাহেন না কেন?

উহা দাদ চুলকানের ন্যায়, ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে আরও বলিতে ইচ্ছা হয়।

সংসারাসক্ত কিরূপ?

সংসারাসক্ত লোক ভাঁড়সে নেউলের ন্যায়। যাহারা নেউল পোষে, তাহারা গৃহের দেয়ালের গায়ে গর্ত্ত করিয়া একটি ভাঁড় বসাইয়া রাখে, নেউলের গলায় এক গাছ দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অপর ভাগে ইট বাঁধিয়া রাখা হয়। নেউলটির ঘরের উঠনে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়ায়, তাড়া বা ভয় পাইলে দৌড়িয়া দেয়ালে হাঁড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিয়া থাকে। সেখানেও অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, গলায় যে ইট ঝুলিয়া থাকে, তাহার ভারে নীচে নামিতে বাধ্য হয়। সংসারাসক্ত লোকের এই প্রকার অবস্থা। তাহারা সময়ে সময়ে শোক দুঃখের আঘাত ও ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধ্বে উঠে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু আসক্তির ইট গলায় ঝুলিতেছে, থাকিতে পারে না, আবার সংসারে নামিয়া আইসে।

শত্রুগণ যিশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন?

সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাঁস পর্য্যন্ত ভেদ করে, কিন্তু খুড়রি নারিকেলের শাঁস ভিতরে আলগা হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাঁস ভেদ করে না। যিশু-খ্রীষ্ট খুড়রি নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিঁধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এইজন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্নমনে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির মধ্যে কি ঈশ্বর স্থিতি করেন?

যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে, চক্ষে দেখা যায় না, চেষ্টা যত্ন করিলে ঘৃত লাভ হয়, সেইরূপ প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর গূঢ়রূপে আছেন, সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বর এক, না বহু?

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বহুরূপী গিরগিটীর ন্যায় বহু রূপ ধারণ করেন। সাধক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। অনেক লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া বহু ঈশ্বর মনে করে।

জীবের কয় প্রকার অবস্থা?

ত্রিবিধ অবস্থা। বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। কতগুলি মাছ আছে যে জালেতে জড়িয়া পড়ে, মুক্ত হইবার জন্য কিছুই চেষ্টা করে না। কতগুলি মাছ জাল ডিঙ্গাইয়া যাইবার নিমিত্ত লম্ফ ঝম্ফ করে, কোন কোন মৎস্য সবলে জাল ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। সংসারজালে এইরূপ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধকের বল কি?

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন বল।

পাপ তাড়ানের উপায় কি?

হাতে তালি দিয়া যেমন গাছের কাক তাড়ায়, সেইরূপ হাত-তালিতে হরি বলে মনবৃক্ষের পাপপাখী তাড়াইয়া দেও।

পৃথিবীর লোকের পূজা ও অর্চ্চনাদি কেমন?

সংসারের লোকে যে সকল পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়, আসল পাইলে তাহারা আর এ সকল পূজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন আসল ঘর প্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়।

ধ্রুব প্রহ্লাদ কিরূপ ছিলেন?

ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না। অধিক বয়সে সাধনে সেরূপ সুমধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না।

নানা দেশে নানা জাতিতে ঈশ্বরের নানা নাম, তাতে কি কিছু দোষ আছে?

কিছু দোষ নাই. এক গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্বতন্ত্র নাম, এক জল তাহাকে পানি বলে, ওয়াটারও বলে, যে নাম হউক না কেন, সমুদায়ই তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ঈশ্বর কোথায় আছেন, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই, ঈশ্বর সংসারে আছেন, সাধন চাই।

—ক্রমশঃ

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮০৮ শক; ১ অক্টোবর ১৮৮৬]

ঈশ্বর কি ভাবে দেহে স্থিতি করেন?

তিনি পিচকারীর কাটির মত আলগা থাকেন।

ভক্ত একা থাকিতে ভালবাসেন না কেন?

একা খেতে গাঁজাখোরের সুখ হয় না, ভক্তও গাঁজাখোরের ন্যায়, একা মা'র নাম করিতে তাঁর মনে তেমন আনন্দ হয় না।

সাধুনামে পরিচিত সকলেই কি সমান?

সাধু সকলেই, তবে কি না (জল) কোনটা স্বাদু খাওয়া যায়, কোনটা জল শৌচে আইসে।

কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে?

ঝিকনে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব-নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ

দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের যাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়।

মানুষ সিদ্ধ হলে কি আর সংসারীদের দলভুক্ত হয় না?

না, যেমন মাটি একবার পুড়িয়ে খোলা হইলে আর কখন মাটির সঙ্গে মিশে না, সেইরূপ। ধান্য সিদ্ধ হইলে যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ সিদ্ধ মনে আর সংসারাসক্তি জন্মে না।

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা?

যেমন আলু ইত্যাদি সিদ্ধ হলে কোমল হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ মন কোমল হইয়া থাকে।

নির্লিপ্ত সংসারী কেমন?

নির্লিপ্ত সংসারী রাজার বাড়ীর দাসীর ন্যায়। রাজবাড়ীর দাসী রাজার ছেলে মেয়েকে আদর যত্ন করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের সেবা করে, কিন্তু জানে যে সেই ছেলে মেয়ে তার নয়, রাজার।

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা। তোমার কোন কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে।

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট, তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন?

হাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন হরণ করেন।

প্রেমাভক্তি কিরূপ?

প্রেমাভক্তিতে সাধক খুব আত্মীয়ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে আমার মা বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না।

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর-দর্শন হয়?

হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে। হৃদয়সরোবর যখন কামনাবায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।

হরির আগমন কিরূপে হয়?

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়, হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়ীতে অগ্রে পাঠান, প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়ীতে গমনকালে পূর্ব্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছে না কেন?

সাঁকোর জল যেমন এক দিক্ দিয়া আইসে, আর দিক্ দিয়া চলে যায়, অনেকের পক্ষে ধর্ম্মকথা তদ্রূপ, তাহারা এক কান দিয়া শোণে, তাহাদের অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ?

একজনে দুর্গোৎসব অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত করে, লোক দেখাইবার জন্য এবং বাহ্যিক আমোদ ও জাঁকজমকের জন্য করে না, ইহাকে সাত্ত্বিক দুর্গাপূজো বলা যায়। একজন পূজোপলক্ষে বাড়ী ঘর খুব সাজায়, নৃত্য গীত ও ফলারের ঘটা করে, ইহাকে রাজসিক পূজা বলা যায়। অন্য একজন পূজায় পাঁঠা মহিষ কাটে এবং অশ্লীল নাচ গান মদ মাংসে মত্ত হয়, এইরূপ পূজাকে তামসিক পূজা বলা যায়। এক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে বলিয়াছিল, "এবার পূজা উঠালে কেন ভাই।" সে বলিল, "দাঁত পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজায় সুখ নাই।" অর্থাৎ দাঁত পড়াতে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায় না, দুর্গোৎসব করে কি করিব?

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরবক্ষস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি, সাগরেতেই স্থিতি। উভয় বস্তুতঃ এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও আশ্রিত।

ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙ্গামুড়ো রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়, তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত সাধন চাই।

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপ চিকের ভিতর যাইয়া তাঁকে দেখেন।

তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই?-

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাঁতে মন চাই।

তাঁতে মন রাখিয়া কি ভাবে সংসার করিতে হয়?

যেমন ছুতরের স্ত্রী ধান সিদ্ধ করে, উনুনে কাঠ গুঁজে দেয়, ঢেঁকীতে যোগায়, তাহার স্বামী ঢেঁকী দিয়া চাল করে, স্ত্রী হাত দিয়া ধান নেড়ে দেয়, এ দিকে স্বামীর সঙ্গে আবার ঘরকন্নার কথা কয়, কিন্তু তার দৃষ্টি হাতের প্রতি থাকে, সেইরূপে ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে সংসারের সমুদায় কাজ কর্ম্ম করতে হয়। কলস মাথায় করে নট যেমন নৃত্য করে, কলসের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে?

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোণা হয়, কিন্তু তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল মন্দ আমিত্ব থাকে না।

বিরক্ত বৈরাগী কিরূপ?

যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বৈরাগী হয়ে বাহির হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দুই দিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরী জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য থাকে না।

হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না?

ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে, সে-ই হাইকোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহারী মাজিষ্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে দ্বারি মিত্র হওয়া যায়।

আমি সংসারের হিসাব ভাবিয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, বলুন আমার আর কি হইবে?

যতক্ষণ গাছ গুণবি, ততক্ষণ আম খা, সংসার সংসার না ভাবিয়া ধর্ম্মফল খা।

ভক্তির তম কিরূপ?

বাহু তুলে নৃত্য করে হরি বোল বলা ভক্তির তম।

[তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ ভাদ্র ১৮০৮ শক; ৩১ আগষ্ট ১৮৮৬]

সাধকপ্রবর ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস।—গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস পরলোক গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার, কঠোর বৈরাগ্য, গভীর প্রেম, প্রভৃতি গুণসকল দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যে সকল ধর্ম্মাত্মা বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রামকৃষ্ণ শিক্ষিত না হইয়াও সরলভাবে ধর্ম্মের এমন সকল নিগূঢ় সারগর্ভ কথাসকল বলিতেন যে তাহা শুনিয়া আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইতাম। এ সকল গভীর সাধন ভজনের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গের একটি উজ্জ্বল সাধক হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে দিব্য জ্ঞানালোকে আরও উজ্জ্বল করিয়া চিরদিন সুখে এবং শান্তিতে রক্ষা করুন।

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮০৮ শক; ১ অক্টোবর ১৮৮৬]

পরমহংসের গান।*

এই হরি নাম (নিসে রে,) জীব যদি সুখে থাকবি,
(মধুর হরি নাম) জীবের দশা মলিন দেখে, হরি নাম

* পরমহংসদেব সচরাচর যে সকল গান করিতেন, তাহার দুইটি এ স্থনে প্রকাশ করা গেল।

এসেছেন গোলোক থেকে, মুখে হরি হরি হরি বল,
হরি বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল থাকলেও ভাল।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
ও মন তুই দেখিস আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
নয়নকে প্রহরী রাখি, সে যেন সাবধানে থাকে।
কুরুচী কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
রসনাকে সঙ্গে রাখ, সে যেন মা বলে ডাকে॥

[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ ১৮০৮ শক; ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৭]

এবার উৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়াছে।...

পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) ও সংক্ষিপ্ত জীবন ... ৵০

[তত্ত্বমঞ্জরী, শ্রাবণ ১২৯২; জুলাই ১৮৮৫]

"**উদ্দেশ্য**।...যে যে উপায় দ্বারা সাধারণে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন তৎসমুদয় প্রচার করা এই পত্রিকার প্রথম উদ্দেশ্য।

আমাদের বর্ত্তমান কালে যেরূপে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ নিয়ম-বিরুদ্ধ এবং তন্নিবন্ধন এত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িকেরা স্ব স্ব ধর্ম্মকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত ধর্ম্ম মনে করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মশ্রেণীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈদিক মতে শিক্ষিত তাঁহারা বেদ ব্যতীত অন্য কোন ভাব ঐশ্বরিক ভাব বলিয়া গণনা করেন না, যাঁহারা তান্ত্রিক তাঁহারা তন্ত্রোক্ত মতকে জগতের শ্রেষ্ঠ মত বলিয়া জ্ঞান করেন, যাঁহারা পৌরাণিক তাঁহারা পুরাণের মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চ বলিয়া প্রকাশ করেন, যাঁহারা ভাগবতীয় ধর্ম্মের বশবর্ত্তী তাঁহারা হরিনামই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এবং উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা মুসলমান তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মকেই ঈশ্বরলাভের প্রকৃত পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগকে কাফের

শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেন। খৃষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মকেই জগতের ঈশ্বর-পথে গমন করিবার একমাত্র রাজপথবিশেষ বলিয়া প্রচার করেন। যাঁহারা এই সকল পুরাতন ধর্ম্মপ্রণালীর অংশবিশেষ দ্বারা অভিনব ধর্ম্মপন্থা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্ম বলিতেছেন তাঁহারাও অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগের ন্যায় ধর্ম্মদ্বেষী। ধর্ম্মরাজ্যের এই আভ্যন্তরিক বিবাদ ও মতভেদের আদি কারণই সত্যবৎ বহির্গত করিয়া পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করা তত্ত্ব-মঞ্জরীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।”

[প্রার্থীকে আত্মজ্ঞান প্রদান ও সর্ব্ব ধর্ম্মকে মহৎ ও কল্যাণপ্রসূ জানিয়া স্বীকার করা পরমহংসদেবের উপদেশের বৈশিষ্ট্য। ‘তত্ত্ব-মঞ্জরী’র উদ্দেশ্য এই দুইটি।]

“**তত্ত্বকথা**।...কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই—বলিতে পারি না মহাপ্রভুর কি সূক্ষ্ম মহিমা যে তাঁহার চরণাশ্রিত ব্যক্তিরাও উহা বুঝিতে অপারক হইতেছেন। মহাপ্রভু আমার দয়ার অবতার, করুণার সাগর। প্রেমের মূর্ত্তি। তাঁহাকে না চাহিলে যখন প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন যাঁহারা তাঁহারই দাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাঁহাদের এ বঞ্চনা কেন? কেন তাঁহারা তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্বরসে বঞ্চিত হইয়া চৈতন্যের সচৈতন্য বাক্যের বিকৃত অর্থ বুঝিয়া বিকৃতাকার ধারণ করিতেছেন। আমরা ইহার তাৎপর্য্য এই বুঝিতে পারি যে তথায় ভিতর বাহির সমান নহে। প্রভু আমার বিশ্বাসীর ঠাকুর। অকপট ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রেমিকের হৃদয়েশ্বর। যে তাঁহাকে যেরূপে যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন, অন্তর্যামী প্রভু আমার তাঁহাকে সেইরূপে সেই পর্য্যন্তই কৃপা করিয়া থাকেন। প্রভুর দয়া না হইলে কে তাঁহাকে বুঝিতে সক্ষম? কে তাঁহার কথার গভীর তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইবার শক্তি ধারণ করিতে পারে? কে তাঁহার লীলার বিচিত্র কৌশল উপলব্ধি করিয়া অপার মহিমার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে? তিনি কেমন, তিনি সৎ কি অসৎ, তিনি দয়াময় কি পাষাণবৎ, তিনি রসিকশেখর কি শুষ্ক নীরস, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান কি দীনদরিদ্র, কি হিন্দুর দেবতা কি মুসলমানের ইষ্টদেব, তিনি জাতিবিশেষের উপাস্য কি জাতি-নির্ব্বিশেষের পরমেশ্বর তাহা তিনি স্বয়ং সাধকের সম্মুখে না

দেখাইলে, না বুঝাইয়া দিলে কাহার জানিবার কিম্বা বুঝিবার অধিকার নাই···।"

['তত্ত্ব-মঞ্জরী'-সম্পাদক ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন এবং একদিন কথা-প্রসঙ্গে স্বয়ং তাঁহার মনোভাব পরমহংসদেবের নিকট নিবেদন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "বামনী ঐ কথা বলত বটে।" বামনী অর্থে তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু ভৈরবী।]

[তত্ত্ব-মঞ্জরী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩; আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।

"**পরিচয়।**···এক্ষণে তোমার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর হইতে প্রকাশিত হইয়া যে সকল তত্ত্ব-কথা ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করিয়া আসিতেছ অদ্য তাহার উৎপত্তির কারণ পাঠক পাঠিকার গোচর করিয়া দাও। কি পরিতাপ! কি অন্তর্দাহ উপস্থিত! সে কথা যে স্মৃতিপথে আনিতে বক্ষস্থল আকুলিত ও হৃদ্‌পিণ্ড মৃদুগামী হইতেছে; মানসিক শক্তি কার্য্যবিহীন এবং হস্ত অচল ভাব ধারণ করিতেছে। কিন্তু কি করিব? তাহা না বলিলেই নয়। আর লুক্কায়িত থাকা যায় না। প্রভু বল দাও, যে বলে এত দিন বলীয়ান হইয়া তোমার গুণগান করিয়াছি, যে বলের দ্বারা ধর্ম্ম-জগতের গুহ্যতম সত্য প্রচার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, প্রভু সেই বল এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া দাসের মনোরথ পূর্ণ করুন।

সেই মহাত্মা যাঁহার নির্দ্দিষ্ট নাম জানি না ও যাহা বলিয়া এ প্রদেশে বিখ্যাত তাহাও প্রকৃত নহে এবং তদ্দ্বারা তিনি লক্ষিত হইলে ভাবান্তর হইয়া যাইবে। কিন্তু উপায় নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট যে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়া উল্লেখিত; তিনিই এই পত্রিকার মহাকারণরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহারই কৃপায় তাঁহারই ভাব, তাঁহারই মত আমরা প্রচার করিয়াছি। তিনি যে সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন সম্প্রদায়ে লক্ষিত হয় নাই। যদিও গীতার যে শ্লোকটী* আমরা আদর্শ করিয়াছি তাঁহার প্রবর্ত্তিত

* "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

ধর্ম্মের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পরস্পরের প্রভেদ স্পষ্টাক্ষরে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এ বিষয় লইয়া আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।”

... ...

“**পূজনীয় রামকৃষ্ণ**। [এই প্রবন্ধের গোড়ায় পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে] ···সাধুরা রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলিতেন এবং অনুমান হয় তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সাধন শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখন তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই। যদিও তাঁহাকে পরমহংস বলা হইত কিন্তু শাস্ত্রমতে যে অবস্থাকে পরমহংস বলে সে সকল লক্ষণ তাঁহাতে নিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। পরমহংস বৈদান্তিক সাধকদিগের চরমাবস্থাকে বলে। অথাৎ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের কার্য্য। তাঁহার এ অবস্থাও ছিল এবং সময়ান্তরে অনিত্য পার্থিব পদার্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া জল, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, প্রস্তরও পূজা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে কোন সম্প্রদায়েই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। অথবা সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার সম্প্রদায় বলিলে সত্য কথা বলা হয়। কারণ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, পরমহংস, যোগী, মুসল-মান, কর্ত্তাভজা, নবরসিক, বাউল, পঞ্চনামী, গৌড়ীয়া, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানাবিধ মতাবলম্বীরা তাঁহার উপাসক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জানিতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তি সাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মোপদেশের পরাক্রমে কেশব বাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।

কেশব বাবু যে সময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্ম শক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক বিতর্ক করেন, তৎসমুদায় আমরা পরমহংসদেবের জীবনচরিতে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিব।

এই তর্কের দ্বারা কেশব বাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্য্য রস তাঁহার মধ্যে ক্ষরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যে নূতন ধর্ম্মভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন ফলের আভাস মাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজে সাধন দ্বারা সকল ধর্ম্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া ছিলেন। কেশব বাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিকরী করিয়া অর্থাৎ যে ধর্ম্মে যেটুকু সার বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ নানক হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলিতেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক মতই সত্য। যে মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুৎ করিয়া লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির মস্তক, কোন ব্যক্তির শরীর, কাহার হস্ত এবং কাহার পদ কর্ত্তন করিয়া একটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে। তাহার শোভা স্বাভাবিক—কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের যে অংশবিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহা তাহারই প্রথম হইতে গণনা না করিলে সে ভাব কস্মিন্‌কালে প্রস্ফুটিত হইবে না। যেমন সন্তানের বাৎসল্য প্রেম প্রেম সন্তান ব্যতীত স্ত্রী কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পিতায় কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না, তেমনই ধর্ম্মের ভাব জানিতে হইবে ঈশার প্রেম ঈশার প্রণালীতে, চৈতন্যের ভক্তি চৈতন্য সম্প্রদায়ে, বুদ্ধের জ্ঞান বৌদ্ধমতে পরিচালিত না হইলে সেই সেই বিশেষ ভাব কদাপি লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। পরমহংসদেব সেই জন্য যখন যে যে মতে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই মতের কোন প্রক্রিয়া

স্বেচ্ছাচারীর বশবর্ত্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা পরমহংসদেবকে নব বিধানের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বলিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এই জন্য বলি যে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পরমহংসদেব যেরূপ সর্ব্বধর্ম্ম বিশ্লিষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি এককালে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে কেহ কোন মতবিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্ম্মপথ বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাহা আমরা এই পত্রিকায় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করা যাইবে।

পরমহংসদেব অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং সেই মর্ম্মেই সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারিতেন। তখন তাঁহাকে অন্য মতাবলম্বী বলিয়া কদাচিৎ বিশ্বাস করা যাইত। তিনি কখন বৈষ্ণবদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেন। কখন বা নিরাকার ব্রহ্মের ভাব লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কখন কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তির নাম কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন এবং কখন বা ঘোষপাড়ার সহজ মানুষের ভাব লইয়া আনন্দে নৃত্যে করিতেন। মসজিদ গীর্জ্জাদির স্থান পর্য্যন্ত কিছুই উপেক্ষা করিতেন না।

পরমহংসদেবের এই ভাব অতি বিচিত্র। তিনি অদ্বৈত জ্ঞান ভিত্তির উপর চৈতন্য-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একাধারে অদ্বৈত জ্ঞান, সর্ব্বত্রে চৈতন্য দর্শন এবং সর্ব্বদা আনন্দ উপলব্ধি করা পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব ভাব ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে অদ্বৈত জ্ঞানের অনেক কথা আছে, এই পন্থার অনেক সাধক হইয়াছিলেন; চৈতন্য দর্শন অর্থাৎ ভক্তি মতেরও অগণন সাধক হইয়া গিয়াছেন, এবং আনন্দ মতেরও ভূরি ভূরি সিদ্ধপুরুষ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ন্যায় সমুদয় ভাব একত্রীভূত করিয়া ইতিপূর্ব্বে কেহই সাধন করেন নাই অথবা শিক্ষা

দেন নাই। যদিও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ যেরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে তাহারই সেইরূপে মনোরথ পূর্ণ হইবে কিন্তু সাধন করিয়া কেহই তাহা এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই অথবা দেখান নাই। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকেরা যদিও কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম একত্রে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কালী ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহারা কালীকেই সকলের নিদান জানিতেন। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাব পৃথক্ পৃথক্ সাক্ষাৎ করিয়া এক স্থানে তাহাদের পর্য্যবসান করিয়া তাঁহারা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রেও এ প্রকার কোন মুনি ঋষি বা অবতারও হন নাই যাঁহাদের দ্বারা এই মহাভাব প্রকটিত গিয়াছে।"

[বেদব্যাস, কার্ত্তিক ১২৯৪; অক্টোবর ১৮৮৭]

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।...এই নিরাশার ঘোর অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যখন ভাবিতে থাকি তখন সুদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। দেখিতে পাই ভারত-জননী এখনও প্রাতঃস্মরণীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাচরণ, রমানন্দ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতী পুত্র প্রসব করিতেছেন। অহো! আজ আমরা যে মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে সংকল্প করিয়াছি, এইরূপ ভক্তের সংখ্যা যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে কি এই সোণার ভারতের এই দুর্দ্দশা থাকিত! কখনই না।

রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তি-তত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে "নিরক্ষর" ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রাম-কৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন। আমরা যথাজ্ঞান সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিব।

[বেদব্যাস, মাঘ ১২৯৪; ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮]

একদিন আচার্য্যদেব [শশধর তর্কচূড়ামণি] তাঁহার কলিকাতার আবাস-ভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্য সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্য,—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনে অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলি কেন, মা' আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কইতে পারছি না। মা! আমায় ভাল করে দে, মা!' এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাই শশধর! দেখ্ আজ মায়ের কাছে বসে আছি এমন সময় মা আমায় বললেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ! আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলি নি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তার কাছে যা, গিয়ে দেখা করে আয়গে।' মা বললেন, আর থাকতে পারলাম না। অমনি চলে এলাম। অনেক দিন আস্‌ব আস্‌ব করছিলাম, আজ তা হয়ে গেল।' এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপরে দুই জনে

নানা ভাব ভঙ্গীতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।...

...পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ* তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভক্তি-ভরে নানা ভাবে পরমহংসের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ভাবের কথা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণকে জানিতেন না এরূপ সাধু সন্ন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রহ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব্বে হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তৎপরে আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশসকল শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিতাম। আমরা এই

*১২৬৮ সালে (ইং ১৮৬১) কলুটোলা শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র-রূপে 'শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তি-কৌমুদী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সভার উপদেশক ছিলেন—বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজী। তিনি এই পত্রিকায় "সর্ব্ব-বেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা" করেন। ইহাতে তিনি নিজের পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন ঃ—

"উক্ত মুনি [উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ] বেদান্ত সম্মত ভক্তিব্যাখ্যা নিমিত্ত বৈদান্তিক সভামধ্যে (ব্রাহ্মসমাজে) ব্যাখ্যাতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন।... সেই মহাত্মার অতুল্য তনয় ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন...। শ্রীযুক্ত ৺বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র সভার উন্নতি সাধনার্থে তপশ্চর্য্যা করেন, তাঁহার পরি-চর্য্যাপরাপণা পদ্মনাম্নী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর বরদেবতা অষ্টাদশ [১৯শ?] শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আমাকে উৎপন্ন করিলেন। পরে আমাকে ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দ্বারা লোক হিত সাধনোদ্দেশে শিক্ষা প্রদান করেন।...মহান্ত শ্যাম অধিকারী আমাকে বিষ্ণুসখী নাম্নী কন্যা বৈষ্ণব বিধানে প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব পুত্র কামনাতে বৈষ্ণব বিধানে বৈষ্ণবী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সভাকক্ষে তোতারাম বাবাজীর প্রেরণাতে উক্ত ব্যাখ্যান বর্ণনা করিলাম" (দ্র° 'বাংলা সাময়িক পত্র', পৃ ১৭২-৭৩)

সময় তাঁহার নিকট নানাধর্ম্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, হিন্দু ত আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তিগদগদভরে তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে "নববিধান" প্রসব হয়। কেশববাবুর শিষ্যেরা যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস, যে, যদি কেশবচন্দ্র জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্ভীক হৃদয় এ সত্য প্রকাশে কদাচ কুণ্ঠিত হইত না। আমাদের সহিত কেশববাবুর বিশেষরূপই পরিচয় ছিল; এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশববাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন।"···(অগ্রহায়ণ, পৃ ২০১-২)

তিনি [আচার্য্য শশধর তর্কচূড়ামণি] বলিতেন 'বর্ত্তমান সময়ে এরূপ উচ্চ-অঙ্গের ভক্তির সাধক অতি বিরল।' সময়ে সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'লোকটাকে সাধারণে চিনিতে পারিল না, পারিবারও কথা নহে। চিনিতে না পারিয়া লোকে অন্যরূপ ব্যবহারে তাঁহার অনেক ক্ষতি করিতেছে।' একদিন পরমহংসের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, পরমহংসের অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়, ভারতে এখনও এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন।··· (মাঘ, পৃ. ২৪১-২)

[সখা, নবেম্বর ১৮৮৮]

···তোমরা হয়ত পুস্তকে বা লোকের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার অলৌকিক ভাব ও ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, মন অপূর্ব্ব ভাবরসে অভিষিক্ত হয়, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বাহির হয়, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইহাঁর ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ

সহজ কথায় কঠিন ধর্ম্মকথাসকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তিসকল ঈশ্বর সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।··· ···

পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, কখন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনিও কেশবচন্দ্রের গৃহে আসিয়া অনেক ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে দেখিতে যান। কতিপয় সাধক ও কতকগুলি লোক ভিন্ন পরমহংসকে সাধারণ লোকে বড় চিনিত না। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কথা ও উপদেশ সকল 'মিরার,' 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখিয়া সাধারণকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত করান। 'পরমহংসের উক্তি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তক কেশব বাবু আপনি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি জনসাধারণের পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কখন বিদ্যাভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু কেশবচন্দ সেনের ন্যায় মহা পণ্ডিত ও জ্ঞানী, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণও, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহারা সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি সকলের দাসানুদাস।" স্ত্রীলোক মাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মা'র ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। কত ঘৃণিত পাপীকে তিনি স্নেহভরে আলিঙ্গন দানে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে গুরুবোধে ভক্তি করিলেও তিনি কাহাকেও শিষ্যজ্ঞান করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। কাহারও একটি সামান্য দোষ দেখিলে তাহা শুধরাইয়া দিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত। পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইত। তাঁহার

এমনই প্রভাব ছিল যে, তাঁহার কাছে যাইলে লোকের কঠোর মন নরম হইত, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে বা অন্য প্রচারকদিগের সহস্র উপদেশে যে ফল না পাওয়া যায় তাঁহার কাছে একবার বসিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যাইত।

কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ যিনি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই; যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহাকে তিনি তদনুরূপ সাধনা করিতে বলিতেন এবং তাহাদের পরিত্রাণ হইবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।··· ···

অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইতে পারে না পরমহংস-চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।-শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দ্রষ্টব্য

আমরা ১৯-২০ পৃষ্ঠায় যে উক্তি-দশক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতেই লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা The *Theistic Quarterly Review* পত্রিকায় প্রতাপচন্দ্র-লিখিত "The Hindu Saint" প্রবন্ধের শেষে উক্তিগুলি যুক্ত ছিল, উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। প্রতাপচন্দ্রের প্রবন্ধটি ১৮৭৬, ১৬ই এপ্রিলের The *Sunday Mirror* হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছি। The *Sunday Mirror*-এর সংখ্যাটি আমরা দেখি নাই। The *Theistic Quarterly Rewiew* হইতে পুনর্মুদ্রিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত উদ্বোধন কার্য্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটি মূল প্রবন্ধের সহিত মিলাইতে গিয়া দেখিলাম মূলে ও পুনর্মুদ্রণে অনেক গরমিল ঘটিয়াছে। ইহা কিরূপে ঘটিল জানি না।

[The *Theistic Quarterly Review*, October 1879]

...If all his utterances could be recorded, they would form a volume of strange and wonderful wisdom. If all his observations on men and things could be reproduced, people might think that the days of prophecy, of primeval unlearned wisdom have returned. But it is most difficult to render his sayings into English. We here try to give some stray bits:—

So long as the bee is outside the petals of the lily, it buzzes and emits sounds. But when it is inside the flower, the sweetness hath silenced the bee. It drinks the nectar, and forgets sounds, and forgets itself. So the man of devotion.

PUT your ghara (earthen pot) inside the brook of clear water. There is bubbling, there is noise, as long as the vessel is empty. When it is full, the bubbling ceases, the disturbance ceases. In silence and fulness the vessel lies in the depth of the element. So the heart in devotion.

BOIL your sugar well in a living and active fire. As long as there is earth and impurity in it, the sweet infusion will smoke and simmer. But when all impurity is cast out, there is neither smoke nor sound, but the delicious crystalline fluid heaves itself in its unmixed worth, and, whether liquid or solid, is the delight of men and gods. Such is the character of the man of faith.

.. THROUGH the stream of the troublous world I float a frail half-sunk log of wood. If men come to hold by me to save their lives, the result will be this: they will drown me without being able to save themselves. Beware of *gurus*.

UNSHOD, and with bare feet who will venture to walk upon thorns and sharp stones? Shod with faith in Hari, what thorn or sharp stone can harm you?

HOLD the post well-driven into the ground with your hand, and then you can quickly revolve round and round without falling. Have faith in a fixed and strong principle, and then though your movements may be many and rapid, no harm will ever befall you. Without principle every movement is a step towards fall.

CHURN your pure milk before the sun rises, and the butter that is thrown up, gather, and put in clear water. There is another kind of butter that is obtained by churning whey after sun-rise, and that is allowed to float in the whey out of which it is churned. The latter kind of butter represents the religion of the Brahmo Somaj, while the former is pure Hinduism.

WOMAN and wealth have drowned the whole world in sin. Woman is disarmed when you view her as the manifestation of the divine Vidya Shakti, power of pure wisdom, as the mother of the human race.

O MOTHER, DIVINE, I want no honor from men, I want no pleasure of the flesh, only let my soul flow into Thee as the permanent confluence of the Gunga and Jamuna. Mother, I am without Bhakti, without Yoga, I am poor and friendless. I want no one's praise, only let my mind always dwell in the lotus of Thy feet.

GOD alone is true, all else is false.

সমসাময়িকদের গ্রন্থে
পরমহংস-কথা

চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালঃ

'কেশবচরিত,' জানুয়ারি ১৮৮৫]

নববিধান।...এই স্থানে দক্ষিণেশ্বরবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের বিষয় কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। এই মহাত্মার সঙ্গে তিনি প্রথমে বেলঘরিয়ার উদ্যানে মিলিত হন। প্রথম মিলনেই উভয়ের হৃদয় এক হইয়া যায়। সাধুরাই লুপ্ত এবং গুপ্ত সাধুদিগকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র যেমন বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা মুসা গৌর শাক্য সক্রেটিস মহোম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মনে সাধুভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মভাবের বিনিময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেশব যাহার ভিতরে ভাল সামগ্রী যাহা কিছু পান তাহা শোষণ করিয়া লন। অবিকল প্রতিলিপির ন্যায় তাঁহার অনুকরণ ছিল না। অন্যের ভাব লইয়া তিনি তাহাকে নূতন আকার প্রদান করিতেন, এবং এক গুণ ভাবকে দশ গুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন। পরমহংসের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ বৈরাগ্য নীতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিল। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্ত্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা ইদানীং তিনি যাহা করিতেন তাহা যে উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? এই প্রেমযোগের কিছু অংশ সকলেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত কেহই আদায় করিতে পারেন নাই। আবার কেশবচন্দ্রের প্রভাবও পরমহংস মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনকে অনেক বিষয়ে পরিমার্জ্জিত পরিশোধিত করিয়া দিয়াছে।

তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতা দায়িত্ব এবং সংসারী লোকের ভক্তি বৈরাগ্য উপার্জ্জনের সম্ভবনীয়তা স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মপ্রচারের প্রস্তাব শুনিলে বলিতেন, "সে সব ঐ আধারে" অর্থাৎ সে জন্য কেশবই আছেন। রামকৃষ্ণ বলেন "আমি বহুকাল পূর্ব্বে একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, চক্ষু বুঁজিয়া স্থিরভাবে সকলে বসিয়া আছে। কিন্তু বোধ হইল, ভিতরে যেন সব লাঠি ধরিয়া রহিয়াছে। কেশবকে দেখিয়া মনে হইল, এই ব্যক্তির ফাত্‌না ডুবিয়াছে।" অর্থাৎ তাঁহার ছিপে মাছ খাইতেছে। এই লোক দ্বারা মায়ের কাজ হইবে ইহা তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রাহ্মসমাজের একজন সহায়করূপে কার্য্য করিতেছেন। উভয়ের যোগে ধর্ম্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (পৃ. ১৩২-৩)

[উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ঃ 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র']

এই সময় (১৫ই মার্চ ১৮৭৫ খ্রীঃ) তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পরদিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি ছেক্‌ড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে

দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন; সেখানে শুনিলেন, আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু, তোমরা না কি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ, আমি তাহা জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং সকলকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। "যখন লুচি ভাজা যায়, তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জ্বাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।" "বানরের ছানা মার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।" ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লাভ করে।" এইরূপ অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে, প্রথমে তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল, পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'গরুর পালে কোন জন্তু আসিয়া ঢুকিলে, সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শোঁকাশুকি করে। পরে আপনার জাতি জানিয়া গা-চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে

এইরূপ মিলন হয়।' কেশবচন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার 'কলিকাতা সমাজে' গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন, যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই করিতেছে। কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'এই লোকটার ফাত্‌না ডুবেছে।'

পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুই দিন পরে বা দুই দিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্য যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনীত উপায়সকল যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন; অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান্, সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের একজন সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক অনাদৃত হয় নাই। যে গৃহের তৃতীয় তল বা দ্বিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয় তল দ্বিতীয় তল এই সকল দ্বারা প্রায় সর্ব্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি! একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত; সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। একদিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে, তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক আপনি ভৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাসক।

তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাঁহার মাতা, এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছাচারসম্ভূত পানভোজনাদিতে রত, পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্ব্বথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, একজন হিন্দু যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরই সম্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহ সকল মহাত্মার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে পাইয়া কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে সময়ে পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য্য হইল। ... ...

পরমহংস রামকৃষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সহ তাঁহার বসতিস্থলে গমন করা, এক প্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সান্তেতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথা সমুদায় এলোমেলো, এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেক ক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহার প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচন্দ্রের কুটীরের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন উদরপূর্ত্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভিড় হইলে কেহ তাহাব ভিতর ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ী আইসে অমনি সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে, এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জ্বল্

জ্বল্ করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্ম-মন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান্ দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বে আর কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

সমসাময়িক প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা

[ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ঃ 'স্বরাজ,' ১০ চৈত্র ১৩১৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।—রামকৃষ্ণ কে। কে তাই জানি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে এই সোণার বাঙলায় এমন সোণার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। বনিতা-বিলাস দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই। তাঁর যখন বিবাহ হয়—তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন ষোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণদেব ঐ লক্ষ্মীকে বিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্ল্লভ। অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শী-পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ-প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ কে। রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে বেদ পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—কেন না উহা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। উহা বোবার স্বপ্নের মত। যে দেখে সে-ই জানে—অপরকে উহা বলিতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কে। তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে—যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য্য শাক্তের ভৈরব-

ভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন এমন কি—তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল-অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদ-ভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈত-বিলাসনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ—কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী — ব্রহ্মবিজ্ঞানী—ভক্ত-চূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

... ...

ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রম-ধর্ম্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দ্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদ বিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতালাভ করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন শক্তির টানে নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে। কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত মন্ত্রবলে এই ভেদ-বৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে।

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।-

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা

খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না - উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।······

১২৯৩ সালে পরমহংস রামকৃষ্ণের দেহোপরম হয়। দেহের উপবম হইল বটে কিন্তু তাঁহার শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাইতেছে ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে।

[যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর-সম্পাদিত 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা']

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদি-সমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতে-ছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, 'এই তিনজনের ভিতর একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।' তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সংকীর্ত্তনের পর আমি বলিলাম, 'আপনি কিছু খান।' তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'হাঁ; মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী থেকে একখানি জিলিপী খেয়ে আসিস্।' আমি একখানি জিলিপী দিলাম, তিনি হাত কাত্ করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, 'দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন 'কেশবের বাড়ীতে যাইতেছ, একটি কুল্পী বরফ খেয়ে এসো।' তখন সেখানে কুল্পী-ওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্পী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্পীওয়ালা আসিল; একটি কুল্পী কেশব

দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্ত্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন, 'দেখ্ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর ঐ ভান্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।'

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন, 'দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে, আর বলে, এই দিকটা তোর আর ওই দিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক্ করে না।' আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন, 'দ্যাখ্, মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।' এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।'

[শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ 'আত্মচরিত']

এইরূপে এক দিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপর দিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্ম্মসাধনের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি এমন সময় 'মিরার' কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর

কোনও মানুষ ধর্ম্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম্ম-সাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছু দিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞা-হীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেক বার দেখিয়াছি; এমন কি অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম্ম এক; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্ম্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটীতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশুখ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন,—ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মত?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার

ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্ত্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।*

[কৃষ্ণকুমার মিত্র]

"১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলিকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে। সে বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ ছিল···ইহার পর এক দিন তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)।···তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইকপাড়ার নিকটবর্ত্তী সিঁথির এক উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল। রাধাবাজারে তাঁহার এক দোকান ছিল। প্রতি বৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত।···পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁহাকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরি-ভোজনের আয়োজন হইত। পরমহংসদেব

* শিবনাথ শাস্ত্রী আরও দুইখানি গ্রন্থে রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন; উহা *History of the Brahmo Samaj* Vol. II. (১৯১২) ও *Men I have seen* (১৯১৯)।

নানা গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অনেকের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী খাইতে পারিতেন। আহারান্তে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইত। একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, "মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" এই কথাটা এখনও আমার মনে আছে। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমার মনে নাই।" ('প্রবাসী,' ফাল্গুন, ১৩৪২)

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মগণই রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর অজ্ঞাত কক্ষ হইতে জনসমাজের নিকট আনয়ন করিয়া, তাহার হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "পরমহংস" উপাধি দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে কালীবাড়ীর পুরোহিত বলিয়াই জানিত।

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সরল ও ভক্তিপূর্ণ জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসের শিষ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই শিষ্য গুরুকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীর ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব দাসের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহু বার দেখিয়াছি। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি। "কত ভালবাস গো মানবসন্তানে" -ব্রহ্মসঙ্গীতের এই গানটি তিনি এমন তন্মগত হইয়া গাহিতেন যে সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মকৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন "ওঁ ওঁ," বহুক্ষণ এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞা লাভ করিতেন।

তাঁহার এই সমাধির অবস্থা আমি অনেক বার দেখিয়াছি। তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন এবং প্রেমে উন্মত্ত হইতেন।" ('আত্মচরিত,' মাঘ ১৩৪৩)

[কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

একদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্ম সমাজে যখন উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই উপাসনাস্থলে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তির ফাত্না ডুবিয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াছেন। এই ঘটনাটির কিছু কাল পরে আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কলুটোলায় শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। কলুটোলার বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন যে, বেলঘরিয়ার সাধনকাননে তিনি ব্রাহ্ম সাধকদের সঙ্গে উপাসনা করিতে গিয়াছেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া বেলঘরিয়ায় যান। সেখানে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল। তিন-চার ঘণ্টা এইরূপে কাটিল। এই ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের ভিতর উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যোগের পর ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কথা, অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার কথা কাগজে লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের লেখা পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের মুখে তাঁহার বিশেষ ধর্ম্মভাবের কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাঁচ বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইয়াছি এবং প্রত্যেক বার চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি। সে-সকল কথা সব স্মরণ নাই। তবে বিশেষ বিশেষ কথাগুলি কিছু কিছু মনে আছে।

আমাদের আলোচনা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া আরম্ভ হইত। তিনি প্রথম আলাপনের দিনে বহুবার জোড়াসাঁকোর কথা বলিলেন; অর্থাৎ শ্রীকেশবচন্দ্রের মুখে উপাসনার সময় যে একটি অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিলেন।

দ্বিতীয় দিবস বেলঘরিয়ার সাধনকাননে যে-সকল কথা হইয়া-

ছিল, তাহারও কয়েকটি কথা যাহা স্মরণ আছে, তাহা এক্ষণে নিবেদন করিতেছি।

পরমহংসদেব বলিলেন যে, "আমি বেলঘরিয়ায় গিয়া দেখি যে কেশবচন্দ্র উপাসনা শেষ করিয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে, তুমি নাকি ব্রহ্মকে দেখ এবং তাঁহার কথা শ্রবণ কর? সে কিরূপ? কেশব বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম-দর্শনের কথা, তাঁর কথা, শুনিয়া আমার মনে হইল, যে, কেশব একজন বিশেষ ব্যক্তি, কেশবের কথা শুনিয়া আমার ভাবাবেশ হইল। আমার মর্ম্মকে স্পর্শ করিল। একবার কেশব বলে, আমি শুনি, একবার আমি বলি, কেশব শুনে, এইরূপে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটিল।" পরমহংসদেব কমলকুটীরে প্রায়ই আসিতেন, সেখানেও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি আসিলেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি জিলাপি খাইতে ভালবাসিতেন। এক-দিন বহু ব্রাহ্ম সাধকদিগের নিকট বলিলেন, "যে সত্য কথা বলে না তার ধর্ম্ম হয় না, ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" এই কথার পর প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজনের শেষ ভাগে একটি জিলাপি লইয়া মুখের সম্মুখে নাড়িতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন, আমি আর খেতে পারব না, পেটে জায়গা নাই। কিন্তু জিলাপি দেখিয়া তিনি বলিলেন, একখানা দাও। ত্রৈলোক্য বাবু একটু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, আপনার সত্য কথা রক্ষা পাইল না। পরমহংস বলিলেন, যখন কোন মেলায় মানুষ যায়, গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ী এলেই রাস্তায় জায়গা হয়, এখন পেটে জিলাপির জায়গা হবে, এতে সত্য রক্ষায় ব্যাঘাত হবে না।

তিনি যে কিরূপ ভাবে সত্যরক্ষা করিতেন তাহার একটি কথা শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে। একদিন আমি কয়েকটি বন্ধু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর তিনি বলিলেন যে, দেখ আমি যদি বলি যে আজ থেকে দু-বার শৌচে যাব, তা হ'লে আমার সন্ধ্যায় বেগ না হ'লেও আমি সত্য রক্ষার জন্য শৌচে যাই।

তিনি ছিলেন খাঁটি লোক, কঠোর সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন

না। ধর্ম্মের নামে কোন আড়ম্বর করাকে ঘৃণা করিতেন। বাহিরে গৈরিক ধারণ, মালা পরিধান ও তিলক ফোঁটা প্রভৃতি আড়ম্বর দেখিলে খুব গ্রাম্য ভাষায় তাহার নিন্দা করিতেন।

ধর্ম্মের জন্য তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। ভগবানকে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা এত অধিক ছিল যে, একবার মুসলমানদিগের ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পাঁচ বার উপাসনা করিতেন, মুসলমানী খাদ্য গ্রহণ করিতেন, মুসলমানী পরিধান পরিয়া ব্রহ্ম অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন এইরূপে সাধনের পর তিনি একটি ভিজ্যন (vision) দেখিলেন, যে, মুসলমানী বেশ ও মুসলমানী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক মূর্ত্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইল। ইহাতে তাঁহার সাধনা বিপথে যাইতেছে অনুভব করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। আরও এইরূপ অদ্ভুত ও উৎকট সাধন তিনি করিয়াছেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে তাঁহার সহসাধক ছিলেন আমরা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেলঘরিয়ায় দেখা হইবার পর মাঘোৎসবের সময় তিনি কীর্ত্তনের দিবস প্রায়ই কমলকুটীরে আসিয়া যোগদান করিতেন এবং শ্রীকেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহাকে পাইলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। একদিন কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম আমি রাধা,' অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা'।

তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় একজন হিন্দু সাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক দিন কমলকুটীরে আসিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিলেন, 'দেখ কেশব তোমার কাছে এলে আমার চোদ্দপোয়া কালী নুনের পুতুলের মত গলে যায়, আমি নিরাকারবাদী হই।' তিনি ব্রাহ্মদের শ্রদ্ধা করিতেন। কেশবচন্দ্রের উপর পরমহংসের কোন কোন বিষয়ে প্রভাব যেমন পড়িয়াছিল, সেইরূপ পরমহংসদেবের উপর শ্রীকেশবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। দু-তিন বার পরমহংসদেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "ব্রাহ্মদের ভিতর কেশব একজন বিশেষ লোক, কেশব বইয়ের কথা বলে না, নিজের ব্রহ্মদর্শনের ও ব্রহ্মশ্রবণের কথা বলে।"

উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইত। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে ইঁহারা উভয়ে উভয়কে এইরূপে আকৃষ্ট করিতেন।

শেষ বয়সে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ বিশেষ উৎসবে যোগদান করা তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন আসিয়া বলিলেন, "কেশব, তুমি যদি চলে যাও, আমি কার সঙ্গে কথা কইব?"

শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানে তিনি বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ('প্রবাসী,' ফাল্গুন ১৩৪২)

[নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

In 1881, Keshab Chandra Sen, accompanied by a fairly large party, went on board a steam yacht belonging to his son-in-law, Maharaja Nripendra Narayan Bhup of Kuch Behar, to Dakhineswar to meet Ramakrishna Paramhansa. I had the good fortune to be included in that party. We did not land, but the Paramhansa, accompanied by his nephew, Hriday, who carried a basket of parched rice and some *sandesh* for us, boarded the steamer, which then steamed up the river towards Somra. The Paramhansa was wearing a red-bordered *dhoti* and a shirt, unbuttoned. We all stood up as he came on board, and Keshab took the Paramhansa by the hand and made him sit close to him. Keshab then beckoned to me to come and sit by their side, and I sat down almost touching their feet. The Paramhansa was dark-complexioned with a beard, and his eyes, never wide open were introspective. He was of medium height, slender almost to leanness and very frail-looking. As a matter of fact, he had an exceptionally nervous temperament, and was extremely sensitive to the slightest physical pain.

He spoke with a very slight but charming stammer in very plain Bengali, mixing the two 'yous' frequently. Practically all the talking was done by the Paramhansa, and the rest, including Keshub himself, were respectful and eager listeners. It is now more than forty-five years ago that this happened, and yet almost everything that the Paramhansa said is indelibly impressed on my memory. I have never heard any other man speak as he did. It was an unbroken flow of profound spiritual truths and experiences, welling up from the perennial spring of his own devotion and wisdom. The similes and metaphors, the apt illustrations, were as striking as they were original. At times, as he spoke, he would draw a little closer to Keshab until part of his body was unconsciously resting on Keshab's lap, but Keshab sat perfectly still and made no movement to withdraw himself.

After he had sat down, the Paramhansa glanced round him and expressed his approval of the company sitting around by saying, 'Good, good! They have all good large eyes.' Then he peered at a young man wearing English clothes and sitting at a distance on a capstan. 'Who is that? He looks like a Saheb.' Keshub smilingly explained that it was a young Bengali who had just returned from England. The Paramhansa laughed, "That's right. One feels afraid of a Saheb.' The young man was Kumar Gajendra Narayan of Kuch Behar, who shortly afterwards married Keshub's second daughter. The next moment he lost all interest in the people present and began to speak of the various ways in which he used to perform his *sadhana*. 'Sometimes I would fancy myself the Brahminy duck calling for its mate.' There is a poetic tradition in Sanskrit that the male and female of a brace of Brahminy ducks spend the night on opposite shores of a river and keep calling to each other.

Again: 'I would be the kitten calling for the mother cat, and there would be the response of the mother.' After speaking in this strain for some time, he suddenly pulled himself up and said with the smile of a child: 'Everything about secret *sudhana* should not be told; He explained that it was impossible to express in language the ecstasy of divine communion when the human soul loses itself in contemplation of the deity. Then he looked at some of the faces around him and spoke at length on the indication of character by physiognomy. Every feature of the human face was expressive of some particular trait of character, he said. The eyes were the most important, but all other features, the forehead, the ears, the nose, the lips and the teeth, were helpful in the reading of character. And so the marvellous monologue went on until the Paramhansa began to speak of the *Nirakara* (formless) *Brahman*. He repeated the word *Nirakara* two or three times, and then quietly passed into *samadhi*, even as the diver slips into the fathomless deep. While the Paramhansa remained unconscious, Keshub Chunder Sen explained that recently there had been some conversation between himself and the Paramhansa about the *Nirakara Brahman*, and that the Paramhansa appeared to be profoundly moved.

We intently watched Ramakrishna Paramhansa in *samadhi*. The whole body relaxed and then became slightly rigid. There was no twitching of the muscles or nerves, no movement of any limb. Both his hands lay in his lap, with the fingers lightly interlocked. The sitting posture of the body was easy, but absolutely motionless. The face was slightly tilted up, and in repose. The eyes were nearly but not wholly closed. The eyeballs were not turned up or otherwise deflected, but they were fixed and conveyed no message of outer objects to the brain. The lips were parted in

a beatific and indescribable smile, disclosing the gleam of white teeth. There was something in that wonderful smile that no photograph was ever able to reproduce.

We gazed in silence for several minutes at the motionless form of the Paramhansa, and then Trailokya Nath Sanyal, the singing apostle of Keshub Chunder Sen's church, sang a hymn to the accompaniment of a drum and cymbals. As the music swelled in volume the Paramhansa opened his eyes and looked around him as if he were in a strange place. The music stopped. The Paramhansa looking at us, asked, 'Who are these people?' And then he vigorously slapped the top of his head several times, and cried out, 'Go down, go down!' No one made any mention of the trance. The Paramhansa became fully conscious and sang in a pleasant voice: 'What a wonderful machine Kali the Mother has made!' After the song the Paramhansa gave a luminous exposition on how the voice should be trained for singing and the characteristics of a good voice.

It was fairly late in the evening when we returned to Calcutta after landing the Paramhansa at Dakshineswar. No carriages could be had at Ahiritola Ghat, and Keshub had to walk all the way to Musjidbari Street to the house of Kali Charan Banerji, who had invited him to dinner.

After seeing and hearing Ramakrishna I went to see Mahendranath Gupta, who was related to me and was my senior by several years, and told him everything and urged him to go to Dakshineswar. This he did the following year, and he was so much impressed by the Paramhansa's manner of speaking that he began keeping a diary in which he jotted down everything the saint said. He told me that what he had heard in one day took him three days to set down in

writing. He had to work for a living and was a teacher and a professor. In the Ramkrishna Mission he is known as Master Mahasay. These diaries were the beginning of *The Gospel of Paramhansa Ramkrishna according to 'M'*. In the original Bengali it is known as *Sri Ramkrishna-kathamrita*—the 'Nectar of the Words of Ramkrishna'. This is the only authentic and, to a certain extent, complete record of the sayings of Ramkrishna. Mahendranath could not go every day, nor could he stay constantly with the Master, and it is quite possible there were other valuable and luminous sayings that were never recorded.

Shortly after I had seen and heard Ramkrishna, I was called away to the other end of India, to Karachi. I never saw him again in life, but I happened to be in Calcutta when Paramhansa Ramkrishna passed into his final rest on August 16, 1886. As I was going out of the house in the afternoon, a printed slip was handed to me announcing that Paramhansa Ramkrishna had passed into the final *Maha-samadhi*. I drove straight to the garden house at Cossipore where the august patient had passed his last days, surrounded and tended with unremitting love and devotion by his disciples, admirers and worshippers. There he lay on a handsome bed covered with a fresh white sheet and flowers, in front of the portico of the house, under the open sky. He lay on his right side, a pillow under his head and another between his legs. The lips which had never ceased teaching even during the months he had been suffering from the intolerable agony of cancer of the throat were stilled in the silence of death. The final serenity, the calm, the peace and the supreme majesty of death were on the face, now smooth and relaxed in its last repose. The smile on the lips showed that the spirit had passed in the rapture of *samadhi*. Narendranath (Vivekananda),

Mahendranath and other disciples, Trailokya Nath of the New Dispensation Church of the Brahmo Samaj and others were seated on the ground. As I sat down beside them and looked at the ineffable peace of the face before us, the words of Ramkrishna came back to me, that the body is merely a sheath and the indwelling real Self is difficult of realization. And as we sat in the waning afternoon, waiting for the heat of the day to pass before carrying the remains to the cremation ground, a single cloud passed overhead and a small shower of very large drops of rain fell. Those present said this was the *pushpavrishti,* the rain of flowers from heaven, of which the ancient books write, the welcome of the immortal gods to a mortal man passing from mortality to immortality, one of the great ones of earth and heaven.

I am convinced that length of years has been granted to me in order that I may be able to bear testimony in the sight and hearing of men that I have seen Ramkrishna and heard him speak in life, and that I have seen him in the peace and serenity of death. (*Reflections and Reminiscences,* 1947)

[অশ্বিনীকুমার দত্ত]

বরিশালের খ্যাতনামা দেশসেবক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যখন কলিকাতায় বাস করিতাম তখন তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসিয়া দুই এক দিন অবস্থান করিতেন এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল এবং এমন আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত এই ভক্তপ্রবরের জীবন সম্পর্কে গল্প করিতেন যে আমাদের চিত্ত তাহাতে একেবারে গলিয়া যাইত।

অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন কেমন করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের "জাদুর" ভিতর পড়িয়া যান। একবার তাঁহার

অগ্নিময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি এত বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে ঐ অল্প বয়সেই ধর্ম্মপ্রচার করার জন্য নগ্নপদে কলিকাতা হইতে যশোহর চলিয়া যান।

অশ্বিনীকুমারের মুখে আমি কেশব-জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর কথাই শুনিয়াছি। যে দুটি কাহিনী আমার প্রাণকে খুব বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। অশ্বিনীকুমার একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। পরমহংসদেবের কুটীরে গিয়া দেখিলেন যে তিনি একখানা কালপেড়ে ফিন্‌ফিনে ধুতি পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন কি জন্য অস্থির।

তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন, আবার বাহিরে গিয়া কি যেন দেখিয়া আসেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে সহসা শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কয়েকটি বন্ধুসহ হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেবের মুখপদ্ম ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। স্নেহময়ী মা তাঁহার অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বহুকাল পরে দেখিয়া যেমন সুখে বিহ্বল হইয়া পড়েন, শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল; তাঁহার প্রিয়তম কেশবচন্দ্র কাছে আসিবামাত্রই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রাণে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম যে তুমি বুঝি আর আসিবে না। তাই আমার মনে বড়ই উদ্বেগ হইতেছিল।" ভক্তের প্রাণ ভক্তের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয় এবং তাঁহাদের সম্মিলনে কি যে মহা প্রেমের আবির্ভাব হয় তাহার জীবন্ত প্রমাণ লাভ করিয়া অশ্বিনীকুমার বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে পরমহংসদেবের প্রাণ পূর্ব্বে কেন এত অস্থির হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেশব! কিছু হবে কি?" কেশবচন্দ্র উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন—"হাঁ হবে বৈ কি!" হাস্যরসপ্রিয় অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের এই সকল সঙ্কেত-বাক্য শুনিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ! বুঝিয়াছি, তবে এখন উঁহাদের সেই বস্তুটি সেবন করিবার সময় উপস্থিত। যেই কথা, সেই কাজ। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল! ঘন রোলে খোল কর্ত্তাল বাজিল!

হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

২। একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র দলে বলে জাহাজে চড়িয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। এ যে কি স্বর্গীয় ব্যাপার তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। পোতখানি নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ও পতাকায় ভূষিত করা হইয়াছিল। প্রকৃতি দেবীও যেন তখন আপনার রাজ্যের অতুল শোভা খুলিয়া দিয়াছিলেন। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ আলোকের মুক্ত সঞ্চরণ। ভক্তগণের কথা আর কি বলিব? তাঁহাদের অঙ্গে গৈরিক, কণ্ঠে ফুলহার, মনে উৎসাহের আগুন, হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ, মুখমণ্ডলে আনন্দের জ্যোতি। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশবচন্দ্রকে তাঁহারা মাঝখানে রাখিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন! মধুর হরিনাম গান, গঙ্গার কুলু কুলু তান, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, বাষ্পীয় পোতের গভীর গর্জ্জন, —সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া এক মহা সঙ্গীত প্রবাহে দূর দূরান্তরে ছুটিয়াছে।

এ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে আপনার কুটীরে বসিয়া কয়েকটি ধর্ম্মপিপাসু লোকের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করিতেছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্রসঙ্গ বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমুখে ভক্তিতত্ত্বকথা! কেনই বা না চিত্তাকর্ষক হইবে? সহসা পরমহংসদেবের কথা থামিয়া গেল, তিনি একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ যে হরিনাম করিতে করিতে কেশব আসিতেছেন!" কেহ কেহ তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ আরও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তোরা কি বুঝবি রে? কেশবের দল ছাড়া ঐভাবে কীর্ত্তন আর কি কেউ করতে পারে?"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহির হইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সুসজ্জিত পোত কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলকে নিয়া ঘাটে লাগিল। তখন হরিনামের মহা রোলে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছিল। পরম-

হংসদেবকে আর ধরিয়া রাখে সাধ্য কার? তিনি জাহাজে উঠিবার জন্য পাগল হইয়া গেলেন। তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য যখন "ও ঠাকুর আপনি কোথা যান?" এই বলিয়া তাঁহাকে থামাইতে গেল, তখন তিনি মুচ্কি মুচ্কি হাসিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এই অদ্ভুত বাণী মাত্র উচ্চারণ করিলেন,—"তোরা যা! রাধা তাঁর শ্যামের কাছে যায়!"

বলা বাহুল্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টীমারে উঠিয়াই শ্রীকেশবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা," তখন ভক্তির বন্যা শতগুণ তেজের সহিত সকলের প্রাণের ভিতর দিয়া বহিতে লাগিল। স্বর্গ আর কাহাকে বলে?—শ্রীমতিলাল দাস ('ধর্ম্মতত্ত্ব,' ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)

* * *

এতদ্ব্যতীত পরমহংসদেবকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন ও পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাই প্রমথলাল সেন ও বি. মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই কেশব-ভক্ত ও নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত। The *Nineteenth Century* (আগষ্ট ১৮৯৬) পত্রে অধ্যাপক পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের "Real Mahatman" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ম্যাক্সমুলার এই প্রবন্ধে পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি প্রকাশ করিয়া পরিশিষ্টে কেশবচন্দ্র সেনের উপর পরমহংসদেবের বিশেষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। ইহাতে নববিধান-সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপত্তি জ্ঞাপন করেন। এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ইঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পরমহংসদেবের কথা বলিয়াছেন। ইঁহাদের উক্তিগুলি মূলতঃ বর্ত্তমান পুস্তকে প্রকাশিত কেশব-পরিকরদের বিবৃতিরই পুনরুক্তি মাত্র; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে এগুলি আর মুদ্রিত করিলাম না। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা জি. সি. ব্যানার্জি-রচিত ও নববিধান কর্ত্তৃক প্রকাশিত Keshab Chandra and Ramakrishna (১৯৩১) পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবেন। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দেও জি. সি. ব্যানার্জিরই নেতৃত্বে কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে আন্দোলন হয়; তিনি প্রাচীন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে

রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে ভাই প্রমথলাল সেনের স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্য। বিতর্কমূলক রচনার যাহা দোষ, অর্থাৎ একদেশদর্শিতা—এই আলোচনাগুলিতে তাহা দৃষ্ট হয়।

সমসাময়িক গ্রন্থ

(তিরোধানের পূর্ব্বে)

১। **পরমহংসের উক্তি**। (২৪ জানুয়ারি ১৮৭৮)। পৃ. ১০।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনই সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণের কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার মূল্য ছিল ৴১০ পয়সা। পুস্তিকায় তাঁহার নামোল্লেখ না থাকিলেও, সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় আছে। আচার্য্যের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে—১৮৮৬ সনে কয়েকটি নূতন উক্তি সহ এই পুস্তিকা পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রে (১৬ ভাদ্র ১৮০৮ শক) প্রকাশ,—

"পরমহংসদেব সময়ে সময়ে যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছেন তাঁহার অনেকগুলি আচার্য্যদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি নূতন উক্তি তৎসঙ্গে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাম 'পরমহংসের উক্তি' মূল্য ৴১০ দুই পয়সা মাত্র।"

২। **পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি**, ১ম ভাগ। ১২৯১ সাল (২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ২৪।

ইহা প্রকাশ করেন—সুরেশচন্দ্র দত্ত। তিনি পরমহংসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—১৮৮৬ সনে ইহার ২য় ভাগ প্রচার করিয়াছিলেন।

"পরে ১২৯৭ সালে 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে এই পুস্তকের ১ম ও ২য় ভাগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৎপরে সুরেশবাবু আরও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করিয়া দিলে ১৩০১, ইং ১৮৯৪ খৃীষ্টাব্দে পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড উপদেশ (এক এক খণ্ডে ১০০টি উপদেশ ধরা হয়) পুনঃ মুদ্রিত করেন।" অতঃপর "সুরেশবাবু যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যোগ করিয়া ১৩১৫ সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণ হয়।" ১৩২১ ও ১৩২৭ সালে সংক্ষিপ্ত জীবনী—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা" ও ৭৫০টি উপদেশ সম্বলিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। "পরমহংসদেবের নিকট

যাঁহারা যাইতেন এবং যাঁহারা বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই উপদেশগুলিই আমরা এই পুস্তকে স্থান দান করিয়াছি।" বর্ত্তমানে ইহার ১১শ সংস্করণ চলিতেছে। ইহাতে ৯৫০টি উপদেশ আছে।

৩। **তত্ত্বসার**। বৈশাখ ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ১৩৯।

গ্রন্থকার রামচন্দ্র দত্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিতেছেনঃ—"সাধু বাক্য প্রচার করাই তত্ত্বসারের সার উদ্দেশ্য। এ কার্য্যটি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত দ্বারা সমাধা হইলেই ভাল হইত···যাহা হউক আমি এক প্রকার সূচনা করিয়া দিলাম, এক্ষণে বোধ হয় তাঁহাদের সাধু হস্ত প্রসারিত হইয়া পরমহংসদেবের উপদেশ সকল তত্ত্বসারের ন্যায় ভূরি ভূরি পুস্তক প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম রাজ্যের নিগূঢ় ভাব সকল প্রকাশিত হইবে।···শেষ বক্তব্য এই, সাধু বাক্যের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যারপরনাই কঠিন। এই জন্য যাঁহার তত্ত্বকথা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছা হইবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিলেই সিদ্ধমনোরথ হইবেন। একদা তিনি ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন 'যে কেহ সরল বিশ্বাসে, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য, ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে আসিবে, তাহার সে বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে'।"

৪। **তত্ত্ব-প্রকাশিকা** বা শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ।

ইহা "শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত" ও খণ্ডশঃ প্রকাশিত: আমরা প্রথম তিন খণ্ড দেখিয়াছি। উহা—

১ম খণ্ড। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক (২০-৬-১৮৮৬)। পৃ. ১-২৪।
২য় খণ্ড। (২০-৪-১৮৮৭)। পৃ. ২৫-৫২।
৩য় খণ্ড। ৩০ আষাঢ় ১৮০৮ শক (৮-৭-১৮৮৭)। পৃ. ৫৩-৭৬।

'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" প্রথম "বহু খণ্ডে বিভক্ত" ছিল। ৪৬০ পৃষ্ঠায় এক সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৮ সালে (মে ১৮৯১) প্রকাশিত হয়।

(তিরোধানের পরে)

৫। **পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) এবং সংক্ষিপ্ত জীবন।** ১৮০৮ শক, মাঘ (২৪ জানুয়ারি ১৮৮৭)। পৃ. ৬৪।

পরমহংসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের ৵০ মূল্যের এই পুস্তকখানি প্রচারিত হয়। পুস্তকে লেখকের নাম না থাকিলেও সরকারী বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতে আছে। গিরিশচন্দ্রের উইলেও পাওয়া যাইতেছে, "আমার রচিত যে সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকাঃ · · · (১১) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন।" ('আত্ম-জীবন,' পৃ. ৬৪)

পুস্তকখানিতে পরমহংসের ৭৫টি উক্তি স্থান পাইয়াছে। এগুলি প্রথমে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' (১লা ও ১৬ই আশ্বিন ১৮০৮ শক) মুদ্রিত হইয়াছিলঃ "এবার তাঁহার কতকগুলি উক্তি প্রশ্নোত্তরানুসারে লিখিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই উক্তিগুলি পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।" এই সকল উক্তি ছাড়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" (১৬ই ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শক) হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনীটিও পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪; ১ম সংস্করণের আকার ছিল 16 Mo. কিন্তু ২য় সংস্করণের আকার অপেক্ষাকৃত বড়, যদিও পৃষ্ঠা-সংখ্যা অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে উহা কেশবচন্দ্র-প্রকাশিত ৵১০ মূল্যের 'পরমহংসের উক্তি' পুস্তিকা ও গিরিশচন্দ্র-প্রকাশিত উহার "২য় সংখ্যা" —এই উভয় পুস্তকের মিলিত রূপ। গিরিশচন্দ্রের পুস্তকে উক্তি-সংখ্যা ৭৫টি;* ইহার সহিত কেশবচন্দ্র-প্রকাশিত উক্তিগুলি সংযোজিত হইয়া, দ্বিতীয় সংস্করণে উক্তি-সংখ্যা মোট ১৮৪টি

---

* পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে পরমহংসের এই উক্তিটি, কেন জানি না, বাদ পড়িয়াছেঃ—

"পাপ তাড়ানের উপায় কি?

লোকে হাতে তালি দিয়া যেমন গাছের কাক তাড়ায়, সেইরূপ হাততালিতে হরি বলে মনবৃক্ষের পাপপাখী তাড়াইয়া দেও।"

দাঁড়াইয়াছে। এই সম্মিলিত সংস্করণ তৃতীয় ও চতুর্থ বার পুনর্মুদ্রিত হয়—১৮১৯ ও ১৮৩৩ শকে, কিন্তু কোনটিতেই লেখকের নাম ছিল না।

১৩৫৬ সালে প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের পুস্তকে "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত," মলাটে এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে; ইহাতে কেশবচন্দ্রের পুস্তিকাখানিও সন্নিবিষ্ট আছে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। ঠিক এই কারণেই ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে লেখক-হিসাবে কাহারও নাম মুদ্রিত হয় নাই। পঞ্চম সংস্করণে নূতন সন্নিবিষ্ট ভূমিকাটির কোন কোন স্থলে তথ্যগত ত্রুটি আছে। এই সংস্করণের একমাত্র বৈশিষ্ট্য,—পুস্তকের পরিশিষ্টে ১৮৭৫-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে *Indian Mirror* ও *New Dispensation* পত্রে প্রকাশিত পরমহংস-সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদের সঙ্কলন।

৬। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত। রথযাত্রা** ১২৯৭ সাল (৮ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ২১০।

রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ইহাই প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী; "পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় শ্রীহৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমরা সেইরূপই লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।"—অবতরণিকা।

৭। **পরমহংসদেবের উক্তি**, ৩য় ভাগ। ইং ১৮৯২। পৃ. ২০।

"সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বারা প্রকাশিত।···সাধু মহীন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃপায় ইহা সংগৃহীত হইল।"

৮। **রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী**, নং ১-১৮। ৫৯-৬৩ রামকৃষ্ণাব্দ (ইং ১৮৯৩-১৮৯৭)।

রামচন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ১৮টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন; এগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও বক্তৃতাস্থলে প্রচারিত হইয়াছিল; বক্তৃতাগুলির বিষয় ও স্থান-কাল এইরূপঃ—

(ক) রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না? (১২৯৯, ১৯এ চৈত্র —ষ্টার থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২২।

(খ) সাকার নিরাকার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ (১৩০০, ১৮ই বৈশাখ—ষ্টার থিয়েটার)। পৃ. ২৪।

(গ) রামকৃষ্ণোক্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমন্বয় (১৩০০, ২২এ জ্যৈষ্ঠ—ষ্টার থিয়েটার)। পৃ. ২৮।

(ঘ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত গুরুতত্ত্ব (১৩০০, ১৯এ আষাঢ়—ষ্টার থিয়েটার)। ১৩০০। পৃ. ২৮।

(ঙ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত পরকাল (১৩০০, ২২এ শ্রাবণ—ষ্টার থিয়েটার)। ১৩০০। পৃ. ২৬।

(চ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব (১৩০০, ১২ই ভাদ্র—ষ্টার থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ৩১।

(ছ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত ব্রহ্ম-শক্তি (১৩০০, ১৬ই আশ্বিন—সিটি থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২২।

(জ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত জ্ঞান ও ভক্তি (১৩০০, ২০এ কার্ত্তিক—সিটি থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২৫।

(ঝ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত বিবেক ও বৈরাগ্য (১৩০০, ১৯এ অগ্রহায়ণ—সিটি থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২০।

(ঞ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ঈশ্বর সাধন (১৩০০, ১৮ই পৌষ—সিটি থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২৮।

(ট) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সাধনের স্থান নির্ণয় (১৩০০, ২৩এ মাঘ—মিনার্ভা থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২৮।

(ঠ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সাধনের অধিকারী (১৩০০, ২১এ ফাল্গুন—মিনার্ভা থিয়েটার)। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২৮।

(ড) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত আত্মা (১৩০০, ১৯এ চৈত্র—সিটি থিয়েটার)। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ২৪।

(ঢ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (১৩০১, ২৪এ বৈশাখ—সিটি থিয়েটার)। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ৪০।

(ণ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত ঈশ্বর লাভ (১৩০১, ২৮এ জ্যৈষ্ঠ—সিটি থিয়েটার)। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ৫৬।

(ত) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম (১৩০২, ২৭এ শ্রাবণ—মিনার্ভা থিয়েটার)। ৬১ রামকৃষ্ণাব্দ। পৃ. ৪৮।

(থ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত জমা খরচ (১৩০৩, ১৫ই ভাদ্র—ষ্টার থিয়েটার)। ৬২ রামকৃষ্ণাব্দ।

(দ) শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃদেবের উপদেশ (১৩০৩, ১৬ই চৈত্র—ষ্টার থিয়েটার)। ৬৩ রামকৃষ্ণাব্দ।

১৯০৫-৬ সনে 'রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী' নামে এই ১৮টি বক্তৃতা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। রামকৃষ্ণ সংগীত

"রামকৃষ্ণদেবোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দত্তের ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা উপলক্ষে সেবকমণ্ডলীকৃত সংগীত।" কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা ইহার প্রথম তিন খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি; এগুলির প্রকাশকাল—

১ম খণ্ডঃ রামকৃষ্ণাব্দ ৫৯ (৩ অক্টোবর ১৮৯৩)। পৃ. ১৫। ইহার সব কয়টি সঙ্গীত বীরভক্ত কালীপদ ঘোষের রচনা।

২য় খণ্ডঃ রামকৃষ্ণাব্দ ৬২ (৪ ফাল্গুন ১৩০২, ইং ১৮৯৬)। পৃ. ২৩।

৩য় খণ্ড : রামকৃষ্ণাব্দ ৬৩ (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১৬।

ইহার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সঙ্গীতই রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। পরে তিন খণ্ড একত্র করিয়া এবং আরও সঙ্গীত যোগ করিয়া 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বা ঠাকুরের নামামৃত' নামে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচয়িতাদের নামও সূচীতে দেওয়া হইয়াছে; অষ্টম প্রচারের তারিখ রামকৃষ্ণাব্দ ১০০, কার্ত্তিক ১৩৪১, ১৯৩৪।

১০। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি**। ইং ১৮৯৪-১৯০১। পৃ. ৫৭৯+২।

অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত, কবিতায় "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত"। ইহা প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। খণ্ডগুলির প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা-সংখ্যাঃ—

১ম খণ্ড	ঃ	পৃ. ১-৪২
২য় খণ্ড	ঃ	পৃ. ৪৩-১৪০
৩য় খণ্ড	ঃ	পৃ. ১৪১-২৭০
৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ	ঃ	পৃ. ২৭১-৩৮২
৩য় খণ্ড, ৩য় ভাগ	ঃ	পৃ. ৩৮৩-৫২৮
৪র্থ খণ্ড	ঃ	পৃ. ৫২৯-৫৭৯

খণ্ডগুলি একত্র করিয়া, আখ্যাপত্র সহ এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়—৬৭ রামকৃষ্ণাব্দে (২৫ নবেম্বর ১৯০১)।

১১। **পদ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ**। প্রথম ভাগ। ১৩০৩ সাল। পৃ. ২৪।

সত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকারম্ভের ভনিতা হইতে জানা যায় ইহা 'পুঁথি'-লেখক অক্ষয়কুমার সেনের রচনাঃ

"বন্দি মাতা শ্যামাসুতা প্রভু অবতারে।
বন্দি প্রভু রামকৃষ্ণে ভক্তি সহকারে॥
বন্দি তাঁদের ভক্ত যত যে যেখানে আছে।
চরণ শরণ চায় অভাজন পদ-রেণু যাচে॥
নামটী আমার শাঁকচুন্নি কল্পগাছে বাসা।
লীলাপুঁথি উক্তি লিখে মিটে যেন আশা॥"

ইহাতে মোট ১৪১টি উপদেশ পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ২য়-৩য় ভাগও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১২। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস** (জীবনী ও উপদেশ)। ১৩০৪ সাল (৯ অক্টোবর ১৮৯৭)। পৃ. ১৯২।

"হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক পরিব্রাজক" সত্যচরণ মিত্র-লিখিত। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ "অনেক নূতন প্রকৃত ঘটনা যুক্ত করিয়াছি—যাহাতে মানুষ ধর্ম্মজীবনে উপকার পায় সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া

এই জীবনী লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু—ডমরু শ্রীমহিমচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তকের অর্দ্ধেক কথা নকুলাবধূত মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

১৩। **হিন্দুধর্ম্ম কি?** ফাল্গুন ১৩০৪। পৃ. ৮ [?]।

স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পরে বিবেকানন্দের 'ভাব্‌বার কথা' (৩০ জুলাই ১৯০৭) পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধরূপে ও স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' পুস্তকের "গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ" খণ্ডের ভূমিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের ইংরেজী রামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ গ্রন্থখানির আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 'ভাব্‌বার কথা'য় সেটিও প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

১৪। **লীলামৃত** (ভগবত্তত্ত্বমূলক নাটক)। ১৩০৭ সাল (১৩ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ১৩২।

"সেবক রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির কাঁকুড়-গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সংগীত সংযোজিত ও প্রকাশিত।"

পরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রও পরমহংসদেবের ভাবাদর্শে 'নসীরাম' প্রভৃতি নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাটক এইটি।

১৫। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত:**

রামকৃষ্ণ-ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীম", "M" বা "মাষ্টার") প্রথমে কথামৃত খণ্ডাকারে ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে সুরু করেন। ইহা ১৮৯৭ সনের কথা। প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হইলে 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' (অগ্রহায়ণ ১৩০৪) যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত···প্রভুর প্রতি তাঁহার যেরূপ

বিশ্বাস সেইরূপ বিশ্বাসের পরিচয়স্বরূপ, প্রভুর উক্তিগুলি মনুষ্য-শক্তিসঙ্গত চেষ্টায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন। আমরা তাহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম খণ্ডে···নববিধান সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত যে সকল তত্ত্বকথার আলাপন করিয়া-ছিলেন, তাহার কিয়দংশ বিবৃত হইয়াছে।···দ্বিতীয় খণ্ডে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে যে সকল বিষয় মীমাংসা করিয়াছিলেন তদ্‌বৃত্তান্তই উল্লিখিত হইয়াছে।···গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই উপদেশগুলি খণ্ডাকারে বাহির না করিয়া একেবারে বৃহদাকারে মুদ্রিত করিলে সাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিলেন কেন? গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্বকথা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে অনেক স্থলে ভাবান্তর হয়, তাহা তাঁহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে।”

১৯০২ সন হইতে শ্রীম-কথিত 'কথামৃত' বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ; বিভিন্ন খণ্ডের প্রকাশকাল এইরূপঃ—

১ম খণ্ডঃ ফাল্গুন ১৩০৮ (১১-৩-১৯০২)। পৃ. ৩৯৪

২য় খণ্ডঃ ১৩১১ সাল (২০-১০-১৯০৪)। পৃ. ৩০৮

৩য় খণ্ডঃ আশ্বিন ১৩১৫ (২৫-৯-১৯০৮)। পৃ. ২৯০

৪র্থ খণ্ডঃ আশ্বিন ১৩১৭ (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ৩৫২

পরিশিষ্টঃ রামকৃষ্ণ জন্মমহোৎসব ১৩৩১ (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৫২

৫ম খণ্ড (পরিশিষ্ট খণ্ড সহ): ভাদ্র ১৩৩৯ (ইং ১৯৩২)। পৃ. ১৭৬, পরিশিষ্ট ৯০, ৫ম ভাগের পরিশিষ্ট ৩৬, ১ম-৫ম ভাগের সূচীপত্র ক-র।

'কথামৃতে' শ্রীম লিখিয়াছেনঃ—“তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী Diaryতে [১৮৮২ সন হইতে] লিপিবদ্ধ

ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল।"

১৬। **বীরবাণী**। (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৩২।

স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত। ইহাতে "ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণ-জিৎগুণেড্যঃ," "আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ঃ যস্য প্রেমপ্রবাহঃ" ও "নব-দেবদেব" এই তিনটি রামকৃষ্ণ-স্তোত্র এবং "খণ্ডন-ভব-বন্ধন" এই শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক এবং "গাই গীত শুনাতে তোমায়" নামক কবিতাটি ছিল। অন্য বিষয়ক স্তোত্র, গান ও বাংলা ইংরেজী কবিতাও ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই পুস্তকে বহু সংযোজন ও ইহার বহু সংস্করণ হইয়াছে।

১৭। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ**। ১৩১১ সাল (১৪ জানুয়ারি ১৯০৫)। পৃ. ৬৪।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-লিখিত। ইহার ১১শ সংস্করণটিতে (পৃ. ১৪৭) "প্রায় এক শত নূতন উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে এবং দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছে।"

১৮। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত**, ১ম ভাগ। ফাল্গুন ১৩১৬ (ইং ১৯১০)। পৃ. ৩৫২।

"গুরুদাস বর্ম্মন্" (বিবেকানন্দ-শিষ্য চিত্রশিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ) প্রণীত। "গ্রন্থপরিচয়ে" প্রকাশ:—

"শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল রামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর কাল বাস এবং পরম যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। মাতুলের দেহত্যাগের পর হৃদয়ানন্দ মধ্যে মধ্যে [বরাহনগরের] মঠে আসিয়া দুই চারি দিন বাস করিতেন এবং সেই অপূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলীর গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে একান্ত মুগ্ধ করিতেন। ..স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ঐ সমস্ত গল্পের কতকগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন; এবং আপনারা যে সকল ঘটনা তাঁহাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক লিখিয়া রাখেন। ঐ খাতাখানি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন।

তাহার উপর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত লিখিত জীবনচরিত, শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি এবং 'শ্রীম' লিখিত কথামৃত হইতেও কতকগুলি ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ প্রত্যেকে কেমন করিয়া তাঁহার পবিত্র সঙ্গ ও কথা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বয়ং আপন কাহিনী লেখককে লিখিয়া দিয়াছেন।

"আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে সরল ও সুখপাঠ্য হয়, এমন গল্পচ্ছলে লিখিত একখানি জীবনচরিতের অভাব ছিল বলিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করা হয়।...যদিও বিশ্বস্তসূত্র হইতে ঘটনাবলী সংগৃহীত, তথাপি পাছে তাহাদের বিবৃতিতে কোন প্রকার ভ্রম বা কোন ঘটনার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, এই ভয়ে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ জন্য যন্ত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে 'উদ্বোধন' হইতে সংগৃহীত সমস্ত পাণ্ডুলিপি স্বামী সারদানন্দের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

এই গ্রন্থে "কেশবের বাটীতে" নামে পরমহংসদেবের যে চিত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ তারিখে গৃহীত ফোটোর প্রতিলিপি।

১৯। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা,** প্রথম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃ. ১৭২।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত। এই পুস্তকে কথোপকথন-ছলে রামকৃষ্ণ-মহিমা বিবৃত হইয়াছে।

২০। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ**ঃ ১৩১৮-২৫ সাল।

স্বামী সারদানন্দ লিখিত। লেখক মহাশয় ইহার এই পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছেনঃ—

১। গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ... শ্রাবণ ১৩১৮। পৃ. ২৭০
২। গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ... আশ্বিন ১৩১৮। পৃ. ৩১৪
৩। সাধকভাব ... ফাল্গুন ১৩২০। পৃ. ৩৯৯+২২
৪। পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন ... বৈশাখ ১৩২২। পৃ. ১৩৩+২
৫। দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ... ফাল্গুন ১৩২৫। পৃ. ৩৭৮

শেষ খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণে (আশ্বিন ১৩৪২) নিবেদনে আছে—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশীপুর উদ্যানে থাকাকালীন ঘটনাবলীর কিয়দংশ ১৩২৬ সালে উদ্বোধনের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল; ইতিপূর্ব্বে কোন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই। এই সংস্করণে পরিশিষ্টাকারে সংযোজিত হইল।"

স্বামী সারদানন্দ এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে পরমহংসদেবের জন্ম-কাল—১৭৫৭ শক, ৬ ফাল্গুন (১৭-২-১৮৩৬), শুক্লপক্ষ বুধবার—এইরূপ নির্দ্দেশ করেন; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন" খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। তদবধি এই জন্ম-সালই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও রামচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবের জন্ম-সাল—১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন—এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে তাহার প্রমাণ—পঞ্জিকায় এই সালের এই দিবসে কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি এবং শুক্রবার হয়।

স্বামী নির্লেপানন্দ উদ্বোধন-কার্য্যালয় হইতে **'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব'** নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উহার প্রকাশ-কাল—৩১ বৈশাখ ১৩৫২ (মে ১৯৪৫), পৃ. সংখ্যা ২২। প্রকাশক লিখিয়াছেনঃ--"লীলাপ্রসঙ্গের ষষ্ঠভাগ লেখার ইচ্ছা স্বামী সারদানন্দের মনে উদয় হইয়াছিল। সাধু ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ইদানীং মধ্যে মধ্যে ঐ কাজে লাগিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। তাঁহার দুইখানি ছোট ছোট নোটবুক আমাদের কাছে ছিল। একখানিতে একস্থলে লেখা আছে—'References to be made in 6th part Lilaprasanga or কাশীপুরে ঠাকুর'—এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় নাই। উক্ত কল্পে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা অধুনা পরিশিষ্ট-আকারে লীলাপ্রসঙ্গ পঞ্চম ভাগভুক্ত। দেখা যাইতেছে, এই দুই খাতার অনেক সংবাদই ইতঃপূর্ব্বে ছাপা হইয়া গিয়াছে। বাকি নূতন সংবাদগুলি, যাহা তিনি পূর্ব্বে ব্যবহার করেন নাই, লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন মাত্র (ভবিষ্যতে ব্যবহার করিতেন কিনা বলা যায় না) তাহা বাছিয়া সাজাইয়া দেওয়া গেল। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই-গুলি প্রবন্ধের উপাদান বা খসড়ামাত্র, পূর্ণাবয়ব প্রাণবন্ত' রচনা নহে। স্বামীর (১৮৬৫-১৯২৭) হাতে-লেখা নোটগুলি যথাসম্ভব তদ্দত্ত আকারেই রক্ষিত হইল।"

২১। দেবগীতি। চৈত্রসংক্রান্তি ১৩১৯ সন (ইং ১৯১৩)। পৃ. ৭৮+২।

"ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের সেবকমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত।"

সঙ্গীত-সংখ্যা ১১৪, গ্রন্থশেষে চারিটি কবিতাও আছে। ১ হইতে ৪২ সংখ্যক গান রামকৃষ্ণ পরমহংস বিষয়ক। বাকি গানগুলি শ্যামা দুর্গা মহাদেব শ্রীহরি ইত্যাদি বিষয়ক। "অবতারণিকা"য় দেবেন্দ্রনাথের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ-বন্দনা "শ্রীগুরুস্তবাষ্টক" বিখ্যাত। তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক "কে তোমারে জানতে পারে" গানটিও সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা প্রথম গানটি এই সুযোগে উদ্ধৃত করিলাম: ১ সংখ্যক গান। শ্রীগুরুস্তবাষ্টক। (তোটক) গৌড়-সারঙ্গ—ঠুংরী।

১

ভবসাগর-তারণ কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

২

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৩

মন-বারণ শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৪

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৫

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৬

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৭

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

৮

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

২২। **পরমহংসদেব** (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কথা)। বৈশাখ ১৩২৯ (ইং ১৯২২) পৃ. ১৫২।

গ্রন্থকার দেবেন্দ্রনাথ বসু এই সুলিখিত রচনাটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। "শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-

লীলাপ্রসঙ্গ' ও পরম ভক্তিভাজন শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' হইতে এই গ্রন্থের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে।"

২৩। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব**। ৫ বৈশাখ ১৩৩১। পৃ. ১৬।

স্বামী প্রেমানন্দ-রচিত। ইহা প্রথমে প্রবন্ধাকারে 'উদ্বোধন' পত্রের ষোড়শ বর্ষে (১৩২০ মাঘ--১৩২১ পৌষ) প্রকাশিত হয়।

২৪। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র-রত্নাকর**। বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৩১। পৃ. ৬৫।

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—"ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভগবান্ শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ একত্রিত হইয়া বরাহনগরে একটি পুরাতন বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতেন। সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য "কালী তপস্বী" যিনি পরে অভেদানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি স্তোত্র রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণদেবের স্তোত্র তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহই রচনা করেন নাই। সন ১২৯৫ সালে প্রথম স্তোত্রটি ["লোকনাথ শিচদাকারো রাজমানঃ স্বধামনি"] শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই স্তোত্রটি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মঠে আবৃত্তি হইত। তৎপর ক্রমে ক্রমে অপর স্তোত্রগুলিও লিখিত হয়। "রামকৃষ্ণস্তবরাজ", "রামকৃষ্ণাষ্টক", "রামকৃষ্ণাবতার স্তোত্র" এবং "সারদা দেবী স্তোত্র"—এই কয়টি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'তে প্রকাশিত হয়।..."রামকৃষ্ণ-গুণামৃত" এবং "রামকৃষ্ণস্তোত্রামৃত" পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই সমস্ত স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ ছিল না। তজ্জন্য সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ উহাদের অর্থ বুঝিতে পারিত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার স্তোত্রগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্ আরাত্রিক ও প্রণাম মন্ত্র যাহা প্রত্যহ বেলুড় মঠে আবৃত্তি হয়" তাহা

এবং "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজাবিধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্তমঠ এই পুস্তকের কয়েকটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শেষ (চতুর্থ) সংস্করণে অনেক সংযোজন হইয়া পুস্তক ১২১ পৃষ্ঠায় দাঁড়াইয়াছে।

২৫। **শ্রীরামকৃষ্ণদেব**। ফাল্গুন, ১৩৩২ (ইং ১৯১৬)। পৃ. ৪৯০।

"শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত ও উপদেশ। ব্যাখ্যাকার শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।" গ্রন্থকারের নিবেদনে প্রকাশ ঃ—"পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী লেখা হবে তাঁর উপদেশের স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাক্‌বে। প্রধান লক্ষ্য থাক্‌বে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আর জীবনীটি তারই উদাহরণ স্বরূপ হবে।' স্বামিজীর সেই মহতী আশা, আমার অল্পমতি, কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার জন্য, অনেকাংশে 'কথামৃত' অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের 'শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত' প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেই লোকাতীত জীবন লেখক যেভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও সেই সঙ্গে লিখিত আছে।"

গ্রন্থের "পরিচয়ে" স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—"যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইনি উহার কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক কয়েক বৎসর বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন।...পাঠক-পাঠিকা যে গ্রন্থকর্ত্তার শ্রীরাম কৃষ্ণচরিত্রালোচনায় অনেক বিষয় নূতন ও শিক্ষিতব্য পাইবেন ইহা বলা বাহুল্য।"

২৬। **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ**। শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৯। পৃ. ১৪৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত ঠাকুরের কথা ও গান।

২৭। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত** [অনুশীলন]। সরস্বতী পূজা ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৭) পৃ. ৪০৮।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল-লিখিত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেনঃ—"ঠাকুর···করুণা-পুরঃসর কহিতেন—অন্নগত, অল্পবুদ্ধি তোরা! কি ক'রে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধারণা করবি? আমাতে প্রাণ ঢেলে দে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। ভক্তসঙ্গ-বিরত দেখে আমায় একদিন বলেন—বেশ! আমাকে নিয়েই থাক্; যেমন নন্দরাণী গোপীদের উপর অভিমান ক'রে বলেছিলেন—বেঁচে থাক্ আমার চূড়াবাঁশী, কত শত মিলবে দাসী। সেই অবধি প্রভুই আমার সম্বল।"

২৮। **দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাতত্ত্ব**, ১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (ইং ১৯৩৮)। পৃ. ১০৫।

"শ্রীশ্রীশশীভূষণ সামন্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত।" গ্রন্থকারের পিতা পীতাম্বর চন্দ্র ("খুদিরাম") রাণী রাসমণির একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—ঠাকুর বাড়ীর ভাণ্ডারী ছিলেন। পুস্তকের "নিবেদনে" প্রকাশঃ—"আমি যখন দক্ষিণেশ্বর ছাত্রবৃত্তি বাংলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি সেই সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কাশীপুর বাগানে আসিয়া স্বর্গে গমন করেন।···দক্ষিণেশ্বরের 'রামকৃষ্ণদেবের লীলা-তত্ত্ব আমি যতদূর জানি এবং আমার পিতা ঠাকুরের নিকট যাহা শুনিয়াছি, এই পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।"

২৯। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান**। ফাল্গুন ১৩৫০। পৃ. ক-ফ+২৫১।

গ্রন্থকার—মহেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত। নিবেদনে আছে, "পরমহংস মশাই মাঝে মাঝে, বোধ হয় ১৮৮২ বা ১৮৮৩ খৃীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, রামদাদার বাড়িতে আসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া-ছিলেন।···অতি সামান্যভাবে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

*　*　*

সুরেশচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয়কুমার সেন আরও কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমসাময়িক হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বিজয় নাথ মজুমদার, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ও সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পুস্তিকাকারে কাব্য-প্রশস্তি আছে।

উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গ্রন্থ

পরমহংসদেবের জীবনী, উক্তি ও ধর্ম্মমত বিষয়ে সম্পূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, বহু পুস্তকের এক বা একাধিক অধ্যায়ে তিনি স্থান পাইয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়খানির সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহার তালিকা দিলাম। অনেক পুস্তকের প্রকাশকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই; কয়েকটি উক্তি ও উপদেশ সংগ্রহের সম্পাদকের নামও জানিতে পারি নাই।

1. PARAMAHAMSA RAMAKRISHNA: Protap Chunder Mazoomdar, Udbodhan Office, 1907. pp. 19.

১৮৭৯ সনের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা *The Theistic Quarterly Review* পত্রের ৩২-৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "The Hindu Saint" প্রবন্ধটি উদ্বোধন-কার্য্যালয় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৬ সনের ১৬ এপ্রিল তারিখের *Sunday Mirror* পত্রে প্রকাশিত হয় বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছি। উদ্বোধন-প্রচারিত পুস্তিকার সঙ্গে *Theistic Quarterly Review* এর প্রবন্ধের কিছু কিছু গরমিল আছে। প্রবন্ধের শেষে দশটি উপদেশ সংযুক্ত ছিল, পুস্তিকায় তাহাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি আমরা বর্ত্তমান পুস্তকের ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। পরিশিষ্টে মূল প্রবন্ধেরও কিয়দংশ পুনর্মুদ্রিত হইল।

2. A Modern Hindu Saint: C. H. Tawney, M.A., Published by S. C. Mitra, 1897. pp. 9.

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল এবং পরে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্ বেঙ্গল, সুপ্রসিদ্ধ টনি সাহেবের এই পুস্তিকাটি *The Imperial and Asiatic Quarterly Review and Oriental and Colonial Record,* January 1896 হইতে পুনর্মুদ্রিত।

3. Ramakrishna His Life and Sayings: The Right Hon. F. Max Muller, K.M., Longman's, Green, & Co., November 1898.

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত আশ্রম কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের *The Nineteenth Century* পত্রে "A Real Mahatma" নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত

ম্যাক্সমূলার পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ শেষে ৩১টি উক্তিও সন্নিবিষ্ট হয়। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্রকে পরমহংসের ভক্ত ও শিষ্য বলাতে কেশব-ভক্তেরা প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তাহারই ফলে ৩৯৫টি উক্তি-উপদেশ সমন্বিত এই বৃহত্তর জীবনীটি লিখিত হয়। জীবনী-অংশ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বলিয়া পুস্তক মধ্যে উল্লেখ আছে। উক্তি-উপদেশগুলিও স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। *Interpreter and the Young Man* পত্রে (নবেম্বর ১৮৯৬) নববিধানমণ্ডলীর উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ম্যাক্সমূলারের মূল প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ করেন তাহাও 'Max Muller on Ramakrishna and Keshub' নামে পুস্তিকাকারে বাহির হয়। ম্যাক্সমূলারের মূল প্রবন্ধও পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাইয়াছি।

4. My Master: Swami Vivekananda. Advaita Ashrama, 9th Impression 1950, pp. 69; Udbodhan Office, 6th ed. 1948, pp. 44.

১৮৯৬, আগষ্ট সংখ্যা *The Nineteenth Century* পত্রে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ প্রকাশের অব্যবহিত পরে ঐ বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ নিউ-ইয়র্কে একটি বক্তৃতা দেন, নাম "Sree Ramakrishna Paramahamsa Deva". ইহা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এস. সি. মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত *Six Lectures by Swami Vivekananda* পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে স্বামীজী লণ্ডনেও পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। নিউ-ইয়র্ক ও লণ্ডনের বক্তৃতা দুইটিকে একত্র করিয়া *My Master* বাহির হয়। সম্পাদন-তারতম্যে উদ্বোধন-সংস্করণ ও অদ্বৈত আশ্রম-সংস্করণে পার্থক্য আছে।

5. THE SAYINGS OF RAMAKRISHNA with an Explanatory Life of Ramakrishna. Compiled by Swami Abhedananda, Ramakrishna Vedanta Math, 2nd ed. July 1946, pp. 244.

প্রথম সংস্করণ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউ-ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়, ভূমিকা বা জীবনী-অংশ তখন ছিল না, পরে সংযোজিত হয়। ইহাতে ৫৫৪টি উক্তি বা উপদেশ আছে।

6. WORDS OF THE MASTER (Selected Precepts of

Sri Ramakrishna) Compiled by Swami Brahmananda. Udbodhan Office, 10th ed. 1945, pp. 113.

স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশে'র অনুবাদ।

7. TEACHINGS OF SRI RAMAKRISHNA. Advaita Ashrama.

বর্ত্তমান সংস্করণে ৯৩০টি উপদেশ আছে। ইহা প্রথমে *Sri Ramakrishna's Teachings* নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল: প্রথম খণ্ড (পৃ. ১২৮) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ১৩৯) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে।

8. SAYINGS OF SRI RAMAKRISHNA. Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras.

সংশোধিত সপ্তম সংস্করণে (১৯৪৯) ১১২০টি উপদেশ আছে।

9. TALES AND PARABLES OF SRI RAMAKRISHNA. Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras.

১৯৪৩, আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭, পৃ. ২৭৩, ২০৫টি উপদেশ। ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে।

10. SAYINGS OF PARAMAHAMSA RAMAKRISHNA. Translated and Edited by Nagendranath Gupta, April 1936. pp. 38 Introduction +170 Sayings.

নগেন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—How Time adjusts its own place and perspective! Undignified squabbles have been heard about how Ramakrishna came to be known to the educated classes in Bengal. It has been alleged that if it had not been for the accident of some distinguished man or another meeting him no one would have heard of the saint of Dakshineswar. If that had been so, so much the worse for humanity, but these quibbles are not worth even a passing thought. Among the men who came into contact with Paramahamsa Ramakrishna there is not one

who will hold the same place in the history of religions or high spiritual manifestation. Of the wealthy men who visited him, or to whose houses he went, not one will be remembered except for the accident of his name having been mentioned in the Gospel of Paramahamsa Ramakrishna. Most of them are already forgotten and their titles and wealth are dust. Some regarded him as an eccentric man, others looked upon him as a curiosity. All these men have passed into oblivion while Time has definitely fixed Ramakrishna's place among the great Teachers of humanity. The few young men he gathered around him all attained great spiritual eminence, while Vivekananda, his most beloved and belauded disciple, has won imperishable fame as prophet, patriot, teacher and heroic champion of his people and his ancient faith."

পরমহংসের উক্তির অনুবাদ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ—

"For the sayings of Ramakrishna I have had to rely mainly upon the Gospel by Mahendranath Gupta. There are only one or two that I have written from personal knowledge."

নগেন্দ্রনাথের ভূমিকাটি মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও দুইখানি পুস্তকে পরমহংস-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার *Reflections and Reminiscences* (১৯৪৭) হইতে আমরা রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার *Nobles Lives* (১৯৫০) পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ৩৩-৭৯) পরমহংসদেব-সম্পর্কিত।

11. Life of Sri Ramakrishna. Compiled from various authentic Sources. December 1924. Advaita Ashrama.

মহাত্মা গান্ধী-লিখিত ভূমিকাসহ।

12. The Life of Ramakrishna. By Romain Rolland, Translated from the original French by E. F. Malcolm-Smith. Aug. 1930. Advaita Ashrama.

13. Studies in Universal Religion : Ramakrishna.

Compiled from various authenticated sources and done into English by Manmatha Nath Chatterji, 1920, pp. 506+18.

14. SRI RAMAKRISHNA AND HIS MISSION: By Swami Ramakrishnananda, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras, 1946, pp. 51.

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব দিবসে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ।

15. THE MESSAGE OF OUR MASTER (by the first disciples of Sri Ramakrishna) Advaita Ashrama, 2nd. ed., 1924, pp. 226.

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আটজন সাক্ষাৎ-শিষ্যের লেখা।

16. RAMAKRISHNA: THE MAN AND THE POWER. Swami Gnaneswarananda, Advaita Ashrama, First Indian Edition, 1946, pp. 108.

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে প্রথম প্রকাশিত।

17. SRI RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA: By K. S. Ramaswami Sastri, B.A., B.L., Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras. pp. 42.

'বেদান্ত কেশরী' পত্রে প্রথম প্রকাশিত।

18. THE MASTER AND THE DISCIPLE: By D. S. Sarma, M.A., Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras, 1947, pp. 155.

কাশী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থকারের *Renaissance of Hinduism* পুস্তকের দুই অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় পরমহংসদেব সম্বন্ধে।

19. SRI RAMAKRISHNA AND MODERN PSYCHOLOGY: By Swami Akhilananda, Vedanta Society, Providence, R. I., 1937, pp. 31.

১৯৩৬ সনে শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

20. SRI RAMAKRISHNA ANL SPIRITUAL RENAISSANCE. Swami Nirvedananda. Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1940, pp. 315.

The Cultural Heritage of India Vol. II. গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

21. THE GOSPEL OF SRI RAMAKRISHNA. Translated into English with an introduction by Swami Nikhilananda, Ramakrishna-Vivekananda Center, New York, 1942, pp. 26+1063.

ইহা "শ্রীম"-কথিত পাঁচ খণ্ড 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ, অনুবাদক পাঁচ খণ্ডকে একত্র করিয়া কালানুক্রমিক সাজাইয়াছেন, শব্দসূচী ও নির্ঘণ্ট যোগ করিয়াছেন। ১২৬-২৭ পৃষ্ঠায় ১৫-সংখ্যক পুস্তক দ্রষ্টব্য। ভূমিকা অংশ বাদ দিয়া অদ্বৈত আশ্রম কর্ত্তৃক ইহার ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও আমেরিকা হইতে বাহির হইয়াছে।

১৯০৭ সনের নবেম্বর মাসে মাদ্রাজ ব্রহ্মবাদিন অফিস হইতে 'কথামৃত' ১ম খণ্ডের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ 'Gospel of Sri Ramakrishna' নামে বাহির হয়। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ বাহির হয় ১৯১২ সনের গোড়ায়। ভূমিকায় ১ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখ দেওয়া আছে। সানফ্রান্সিস্‌কো হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দেই আর একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজ, ময়লাপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ১০ বৎসর পরে ১৯২২ অক্টোবর মাসে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন।

'কথামৃতে'র প্রথম দুই খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ পরে নিউ-ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৯০৭, ডিসেম্বর মাসে *The Gospel of Ramakrishna Authorised Edition* নামে একত্র বাহির হয়। ভূমিকায় সম্পাদক স্বামী অভেদানন্দ লেখেন:—This is the authorized English edition of the "Gospel of Ramakrishna," ...... They were taken down in the form of diary notes by a house-holder disciple, "M".

At the request of Sri Ramakrishna's Sannayasin disciples, however, these notes were published at Calcutta during 1902–1903 A.D., in Bengali, in two volumes, entitled "Ramakrishna Kathamitra."

At that time "M" wrote to me letters authorising me to edit and publish the English translation of his notes, and sent me the manuscript in English which he himself translated..............

At the request of "M" I have edited and remodelled the larger portion of his English manuscript; while the remaining portions I have translated directly from the Bengali edition of his notes.

The marginal headings, foot-notes and index, as well as the division of the 'Gospel' into fourteen chapters, were added by me................"

১৯৩৯ এপ্রিলে কলিকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে ইহাই *The Memoirs of Ramakrishna* নামে বাহির হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ঃ সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত

ডিসেম্বর ১৮৮৪। (দ্রষ্টব্যঃ পৃ. ১৪৭-৪৮, ২ সংখ্যক গ্রন্থ)

[প্রথম ভাগ]

সমুদ্রের জল পান না করিয়া, তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব যেমন বলিতে পারা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে। ১

যেমন একই জল ভিন্ন দেশে বারি পানি ওয়াটার প্রভৃতি ভিন্ন২ নাম ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ এক সচ্চিদানন্দ দেশভেদে আল্লা, জিহোবা, হরি, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছেন। ২

মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছে। ৩

দুই ব্যক্তি পরস্পর ঘোর তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। একজন বলিতেছে, অমুক উদ্যানে সুন্দর লাল বর্ণের একটি পক্ষী আছে। অপর জন বলিতেছে, তোমার ভুল হইয়াছে, পক্ষীটি লাল বর্ণ নয় নীল বর্ণ বিশিষ্ট! তর্কের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে উভয়ে উদ্যানরক্ষকের নিকট উপস্থিত হওত প্রথম ব্যক্তি বলিল—"কেমন হে উদ্যানরক্ষক, তোমার এই উদ্যানে একটি লাল বর্ণের পক্ষী আছে"। উদ্যানরক্ষক বলিল—"আজ্ঞে হাঁ"। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"কি বলিলে, সেটি তো লাল পক্ষী নয় নীল পক্ষী"। উদ্যানরক্ষক বলিল—"আজ্ঞা হাঁ"। উদ্যানরক্ষক জানিত সে পক্ষীটি বহুরূপী এজন্য যে যে বর্ণ বলিল সে তাহাতেই হাঁ বলিল। সচ্চিদানন্দ হরিরও বহুরূপ, তিনি এক তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান। যে তাঁহাকে দেখে নাই, যে তাঁহার মর্ম্ম বুঝে নাই সেই সাকার নিরাকার লইয়া তর্ক করে কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন, হাঁ, তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। ৪

কোন পথ অবলম্বনীয়? বলিলেন—"আমাদের পক্ষে আর্য্য ঋষিদিগের পথ, সনাতন পথই শ্রেয়"। ৫

[পরমহংস মহাশয়ের নিকট সকল সম্প্রদায়ের লোক চিরদিন সমভাবে আদৃত হইয়া থাকেন। হিন্দুদিগের পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেয় বলিয়াছেন বলিয়া কেহ যেন তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক মনে না করেন।]

প্রশ্ন হইল—হিন্দুদিগের মধ্যে যখন নানা মত প্রচলিত রহিয়াছে তখন আমরা কোন্ মত গ্রহণ করিব? বলিলেন—পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ রূপের খেই (মূল) কোথা? মহাদেব বলিলেন—"বিশ্বাস"। মতে কিছু আসে যায় না, যিনি যে মতে দীক্ষিত হইয়াছেন বিশ্বাস সহকারে তিনি তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। ৬

সমুদ্রে এক প্রকার সামুক আছে তাহারা সদাসর্ব্বদা হাঁ করিয়া জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক বিন্দু জল তাহাদের মুখে পড়িলে, তাহারা মুখ বন্ধ করিয়া একেবারে জলের নিম্নে চলিয়া যায় আর উপরে আইসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেইরূপ গুরুমন্ত্ররূপ একবিন্দু জল পাইয়া, সাধনার অগাধ জলে একেবারে নামিয়া যায় আর অন্যদিকে দৃষ্টি করে না। ৭

যাঁহার নিকট যে কিছু শিক্ষা পাই তাঁহাকেই গুরু না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে গুরু বলিবার প্রয়োজন কি? বলিলেন—"ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহার নিকট যায় তাহার কিছুই আবশ্যক নাই, কিন্তু সচরাচর সেরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই গুরুর প্রয়োজন হয়। গুরু এক হইলেও উপগুরু অনেক হইতে পারে। যাঁহার নিকট কিছু শিক্ষা পাই তিনিই উপগুরু। অবধৌত এরূপ ২৪টি উপগুরু করিয়াছিলেন"। ৮

একদিন মাঠের উপর দিয়া যাইতে২ অবধৌত দেখিলেন সম্মুখে ঢাক ঢোল বাজাইতে২ মহা সমারোহের সহিত একটি বর আসিতেছে এবং পার্শ্বে একটি ব্যাধ একাগ্রচিত্তে আপনার লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে এমন যে সমারোহের বর আসিতেছে তাহার প্রতি একবারও সে চাহিয়া দেখিতেছে না বরং ব্যাকুলিত হইতেছে পাছে

ঐ গোলযোগে তাহার পক্ষিটি উড়িয়া যায়। অবধৌত অবনত মস্তকে সেই ব্যাধকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, প্রভু, তুমি আমার গুরু, আমি যখন ধ্যানে বসিব তখন যেন এইরূপে লক্ষ্য করি। ৯

এক ব্যক্তি মৎস্য ধরিতেছে, অবধৌত তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, অমুক স্থানে কোন্ পথে যাইব? তাহার ফাতনায় তখন মৎস্য খাইয়াছে, সে কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে মৎস্য প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিল এবং কার্য্য সমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "আপনি কি বলিতেছিলেন"? অবধৌত অবনত মস্তকে বলিল, আপনি আমার গুরু, আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে বসি তখন যেন এইরূপ আপন কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া আর অন্যদিকে মন দি না। ১০

এক বক আস্তে২ একটি মৎস্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে, পশ্চাতে এক ব্যাধ সেই বকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু বক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। অবধৌত অবনত মস্তকে সেই বককে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি যখন ধ্যানে বসিব তখন যেন ঐরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখি না"। ১১

এক চিল মৎস্য মুখে করিয়া যাইতেছে পশ্চাতে শত২ কাক চিল আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। সে যেদিকে যায় শত২ কাক চীৎকার করিতে২ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া সেই মৎস্য ফেলিয়া দিল, অপর একটি চিল আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং সমুদয় কাক চিল তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। প্রথম চিলটি নিরাপদে এক বৃক্ষে বসিয়া রহিল। অবধৌত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, "বুঝিলাম এ সংসারে লঘুভার হইতে পারিলেই শান্তি নতুবা মহা বিপদ"। ১২

তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর অপরকে তাহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও। বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না। ঈশ্বরের কৃপা হইলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে। ১৩

অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের আবশ্যক হয় কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

লোকশিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পাঠ আবশ্য হয় বটে কিন্তু আপনার ধর্ম্ম লাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে। ১৪

অল্পজলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে২ পান করিও কেননা তাহা পরিষ্কার, কিন্তু আলোড়ন করিও না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব, পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না। ১৫

এক উদ্যানে দুই ব্যক্তি বেড়াইতে গিয়াছে। তন্মধ্যে যাহার বিষয়বুদ্ধি প্রবল তিনি প্রবেশ করিয়াই উদ্যান মধ্যে কয়টি আম্র গাছ, প্রত্যেক গাছে কত আম্র হইয়াছে, উদ্যানটির মূল্য কত হইতে পারে ইত্যাদি গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অপরজন বৃক্ষতলে বসিয়া একটি করিয়া আম্র পাড়িতে লাগিলেন এবং তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বল দেখি কোন্ জন বুদ্ধিমান? ধর্ম্ম-উদ্যানেও প্রতিদিন এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। যাঁহারা জ্ঞানাভিমানী তাঁহারা শাস্ত্রীয় মীমাংসা, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন কিন্তু সুবুদ্ধি সাধক সাধনা-রূপ বৃক্ষতলে বসিয়া সুস্বাদু প্রেমভক্তি যোগ ফল সকল আস্বাদন করিতেছেন। ১৬

কাঁচা ময়দা গরম ঘৃতে ফেলিয়া দিলে ছক্ ছক্ করিয়া শব্দ হয় এবং যে পরিমাণে ময়দা ভাজা হইতে থাকে সেই পরিমাণে শব্দেরও হ্রাস হইয়া আইসে। অল্প জ্ঞান পাইলে মনুষ্য বক্তৃতাদিতে বাহ্য আড়ম্বর করিতে থাকে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর সম্ভবে না। ১৭

সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়া যিনি সাধনা করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীর সাধক। ১৮

প্রশ্ন হইল সংসার ও ঈশ্বর, উভয় কার্য্য একত্র কিরূপে সম্ভবে? বলিলেন, একটি স্ত্রীলোক এক হস্তে ঢেঁকিতে চিঁড়া দিতেছে, অপর হস্তে সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া দুগ্ধপান করাইতেছে, মুখে হয়ত পথের কোন লোকের সঙ্গে চিঁড়ার হিসাব করিতেছে। এইরূপে সে অনেক কার্য্য করিতেছে বটে কিন্তু তাহার মনে২ দৃষ্টি যেন হস্তে ঢেঁকিটি

পড়িয়া না যায়। সংসারে থাকিয়া সকল কার্য্য কর কিন্তু দৃষ্টি রাখিও যেন তাঁহার পথ হইতে দূরে না পড়িয়া যাও। ১৯

কুম্ভীর জলের উপরিভাগে ভাসিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু কি করে, মনুষ্যের উৎপীড়নে, প্রাণভয়ে অগত্যা জলের মধ্যে থাকিতে হয়, উপরে ভাসিতে পারে না। তথাপি সে সুবিধা মতে হুস২ করিতে২ জলের উপরিভাগে এক একবার আইসে। হে সংসারী মানব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিতে তোমারও ইচ্ছা হয়, আমি জানি. কিন্তু কি করিবে স্ত্রীপুত্র পরিজন পালনের জন্য যদি তোমাকে একান্তই ভ্রান্তির অগাধ জলে নামিতে হয়, তবে মধ্যে২ এক একবার হরিনাম স্মরণ করিও. তাঁহার নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিও. দুঃখ জানাইও, তিনি যথা সময়ে অবশ্যই তোমাকে মুক্ত করিবেন। ২০

শব সাধন করিতে হইলে পার্শ্বে ছোলা ও জল রাখিয়া দিতে হয়। সাধনার কোন সময়ে যদি ঐ শব জাগ্রত হইয়া মুখ ব্যাদান করে তবে ঐ ছোলা ও জল তাহার মুখে প্রদান করিলে সে নিস্তব্ধ হইবে নতুবা তোমার সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইবে। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সাধনা করিতে হইলে অগ্রে সাংসারিক খরচপত্রের স্থিত করিয়া বসিতে হইবে নতুবা তোমার সাধনার ব্যাঘাত জন্মিবে। ২১

বালক যেমন খুঁটি বা স্তম্ভ ধরিয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে পড়িবার আশঙ্কা করে না, সংসারে সেইরূপ ঈশ্বরকে ধরিয়া সকল কার্য্য কর, নিরাপদ থাকিবে। ২২

বাউল যেমন দুই হস্তে দুই প্রকার বাদ্য বাজায় এবং মুখে গান করে. হে সংসারী মানব, তুমিও ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া সেই-রূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাক। ২৩

নষ্ট স্ত্রীলোক পিতা মাতা প্রভৃতি সমুদায় পরিজন মধ্যে বাস করত নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত রহিয়াছে কিন্তু তাহার মন তাহার উপপতি প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। হে সংসারী মানব! তুমিও পিতা মাতা প্রভৃতি মধ্যে থাকিয়া সমুদায় কার্য্যে ব্যস্ত থাক কিন্তু তোমার মনকে সেই হরির প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিও। ২৪

ধনীদিগের গৃহে দাসীগণ প্রভুর সন্তান সন্ততিদিগকে মাতার ন্যায় লালনপালন করিয়া থাকে কিন্তু মনে২ তাহারা নিশ্চয় জানে যে ঐ সন্তান সন্ততিদিগের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। হে মানব! তুমিও তোমার সন্তান সন্ততিদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও কিন্তু মনে নিশ্চয় ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে ঐ সকল কিছুই তোমার নহে। ২৫

লুকাচুরি খেলায় বুড়ি স্পর্শ করাই নিরাপদ। যে বুড়ি স্পর্শ করিয়াছে তাহাকে আর কেহ চোর করিতে পারিবে না। সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে অথচ তাহাকে আর চোর করিবার উপায় নাই, কেন না সে বুড়ি স্পর্শ করিয়াছে। সংসারেও সেইরূপ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারিলে আর ভয় নাই। যিনি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছেন, সংসারের সকল অবস্থাতে তিনি নিরাপদ থাকিবেন, কিছুতেই তাঁহাকে মলিন করিতে পারিবে না। ২৬

যে লৌহ স্পর্শমণির সংস্পর্শে সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে আর কোনমতেই লৌহ করিতে পারিবে না। মৃত্তিকার নিম্নে, পঙ্কের মধ্যে যথা ইচ্ছা তাহাকে ফেলিয়া রাখ, সে স্বর্ণই থাকিবে আর লৌহ হইবে না। ঈশ্বরস্পর্শকারী প্রত্যেক জনেরও ঐরূপ অবস্থা। পৃথিবীর ঘোর নির্যাতন, দুঃখ দরিদ্রতা, কিছুতেই তাঁহা-দিগকে আর অপবিত্র করিতে পারিবে না। ২৭

চকমকি প্রস্তর শত বর্ষ জলের মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও লৌহ দ্বারা আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান শতসহস্র অবিশুদ্ধ অবস্থার মধ্যে বাস করিলেও তাঁহার অন্তরের ভাব কখনই বিদূরিত হইবে না। ২৮

বাষ্পীয় শকট গুরুভারবিশিষ্ট দ্রব্য সকল বহন করত অনায়াসে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়; বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও মহা ভারাক্রান্ত সংসারের গভীর পরীক্ষার মধ্যে স্থির ও শান্ত থাকিয়া অনায়াসে সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণা অপমান বহন করেন। ২৯

স্রোতের জল বেগে যাইতে২ এক এক স্থলে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সোজা হইয়া বেগে চলিয়া যায়। পবিত্র আত্মা ধার্ম্মিকদিগের মনেও অবস্থা বিশেষে অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ

প্রভৃতির আভা পড়ে কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিতে পায় না, শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া যায়। ৩০

এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলার সময় হরি নানা ভাবে এখানে সদা লীলা করিতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুসি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানাবিধ পদার্থ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তান চুসি ফেলিয়া দিয়া, মা বলিয়া চীৎকার করিলে মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও যদি পার্থিব মমতাবিহীন হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য চীৎকার করিতে পারি তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হন। ৩১

শত বৎসরের অন্ধকারপূর্ণ গৃহ যেমন এক প্রদীপের আলোকে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়, ঈশ্বরের কৃপায় সেইরূপ এক মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সমুদায় পাপ দূর হইয়া যায়। যাহার হৃদয়ে বিষয়বাসনা প্রভুত্ব করিতেছে, যাহার আমড়ার আম্বল খাইবার এক্ষণেও সাধ রহিয়াছে, সেই জীবনে পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা না করিয়াও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে প্রতিদিন উপাসনা করে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি বলেন "ঈশ্বরের কৃপায় আমি এই মুহূর্ত্তে পবিত্র হইব"। ৩২

যেমন সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত চুম্বক প্রস্তর অকস্মাৎ জাহাজের সমুদায় লৌহনির্ম্মিত পেরেক প্রভৃতি টানিয়া লইয়া জাহাজখানিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে, অহঙ্কার-স্বার্থপরতা-পূর্ণ জীবনতরী মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া, ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ৩৩

মাঠের জল কেহ ব্যবহার না করিলেও, সূর্য্যকিরণে আপনি শুখাইয়া যায়। পাপী মানব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিলে, তাঁহার দয়াগুণে, আপনা আপনি পবিত্র হইয়া যায়। ৩৪

যেমন সামান্য বালককে সুরা পানের সুখ বুঝান অসম্ভব, সেই-রূপ বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবকে ধর্ম্মের স্বর্গীয় সুখ বুঝান অসম্ভব হইয়া পড়ে। ৩৫

ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়, অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর। ৩৬

মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়াতে সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া গেলে যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হইলে সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়। ৩৭

তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড২ দেখায়, মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অন্তরে সেইরূপ ঈশ্বরের আংশিক আভা মাত্র দেখা যায়। ৩৮

মায়াকে চিনিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। যেমন কোন গ্রামে এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য নাই। পথিমধ্যে এক মুচিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ওরে আমার সঙ্গে যাবি। উত্তমরূপে আহার করিতে পাবি এবং অতি আদরে থাকিবি, চল্ না? মুচি বলিল, ঠাকুর মহাশয়, আমি অতি নীচ জাতি, আমি কিরূপে আপনকার দাস হইয়া যাইব? গুরু বলিলেন, তাহাতে কোন চিন্তা নাই, তুই কাহাকেও আপনার পরিচয় দিস্ না এবং কাহারো সহিত আলাপ করিস্ না। মুচি সম্মত হইল। অপরাহ্নে শিষ্যবাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা করিতেছেন এমন সময় অপর একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই ভৃত্যকে বলিতেছে—অমুক স্থল হইতে আমার জুতা যোড়াটা আনিয়া দাও। ভৃত্য কথা কহিল না। ব্রাহ্মণ আবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নীরব। ব্রাহ্মণ তিন চারিবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নড়িল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিল—আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস্ না, তুই কি জাত, তুই মুচি নাকি? ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে২ সেই গুরুর দিকে তাকাইয়া বলিল "ঠাকুর মহাশয় গো ঠাকুর মহাশয় গো, আমায় চিনেছে আমি পালাই" এবং সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ৩৯

হরিদাস বাঘের মুখস্ মুখে দিয়া একটি বালককে ভয় দেখাইতেছে। বালক ভয়ে চীৎকার করিতেছে। মাতা আসিয়া বালককে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "ওকে আবার ভয় কি, ও যে আমাদের হরে, ও কাগজের মুখস্ মুখে দিয়াছে"। বালক তাহাতে

থামিল না। পরে যখন হরিদাস আপন মুখস্ খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মুখস্‌টি তাহার হস্তে দিয়া বুঝাইল তখন বালক সকলই বুঝিল আর সে মুখসে ভয় পায় না। ৪০

বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত শাস্ত্র পাঠ বৃথা। বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। ৪১

হস্তীকে ছাড়িয়া দিলে চতুর্দ্দিগের বৃক্ষ সকলকে ভাঙ্গিতে যায়। এবং তাহার মস্তকে ডাঙ্গস্ মারিলে সে নিরস্ত হয়। মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানাপ্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং বিবেক-রূপ ডাঙ্গস্ না মারিলে সে নিরস্ত হইবে না। ৪২

ধ্যান করিবে কোণে, বনে আর মনে। ৪৩

মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য, ধ্যান করিবার পূর্ব্বে হাততালি সহকারে কিয়ৎকাল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিবে। বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষী সকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমার মনরূপ বৃক্ষস্থিত চিন্তারূপ পক্ষী সকলও উড়িয়া যাইবে। ৪৪

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনা আপনি জল আইসে তাহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না। ৪৫

এক ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকর রত্নহীন মনে করিও না। ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথা সময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে। ৪৬

এক ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া দুই হাত মাটি কাটিয়াছে এমন সময় অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ভাই, তুমি বৃথা পরিশ্রম করিতেছ কেন? ইহার নিম্নে জল পাইবে না কেবলই বালি বাহির হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থল ত্যাগ করিয়া অপর এক স্থলে মাটি কাটিতে লাগিল। তথায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল— ভাই, এখানে পূর্ব্বে পুকুর ছিল, বৃথা কষ্ট করিতেছ কেন? কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিগে অগ্রসর হইয়া কাটিলে সুন্দর জল বাহির হওয়ার সম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। তথায় অপর একজন আসিয়া আবার

তাহাকে নিষেধ করিল। এইরূপে সে যত স্থল মনোনীত করিয়াছিল একে একে আবার সে সকল স্থলই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার পুকুর আর কাটা হইল না। ধর্ম্মপথেও অনেকে এইরূপে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। আজি যাহা বিশ্বাস করিলেন, বিপদে পরীক্ষায় পড়িয়া কল্য তাহা ত্যাগ করিলেন এবং অবশেষে হয় একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়িলেন নতুবা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন "এ জীবনে ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব"। ৪৭

এক ব্যক্তি সমস্ত দিবস ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া অবশেষে দেখিল যে একবিন্দু জলও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, দূরে কতকগুলি গর্ত্ত ছিল তাহা দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ যিনি বিষয় আকাঙ্ক্ষা পার্থিব মান সম্ভ্রম সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি আসক্তি রাখিয়া উপাসনা করিতেছেন, আজীবন উপাসনা করিয়া অবশেষে তিনিও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল আসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া তাহার সমুদায় উপাসনা বাহির হইয়া গিয়াছে, তিনি যে মানুষ সেই মানুষই পড়িয়া আছেন একবিন্দুও উন্নতি করিতে পারেন নাই। ৪৮

এক কাঠুরিয়া অরণ্য মধ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করে। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণ সেই পথে যাইতে২ তাহার দুঃখ দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, অগ্রসর হইয়া যাও" কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণবাক্য অবহেলা করা অবিধেয় ভাবিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে চলিয়া গেল। যাইতে২ এক চন্দনবনমধ্যে উপস্থিত হইল এবং সেদিন যতদূর সাধ্য চন্দনকাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিল। সেদিন তাহার আয় শতগুণ অধিক হইল। পরদিন কাঠুরিয়া মনে২ ভাবিতে লাগিল—ঠাকুর মহাশয় আমাকে চন্দনকাষ্ঠের কথা তো কিছু বলেন নাই, কেবলমাত্র বলিয়াছেন "অগ্রসর হইয়া যাও" অতএব আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে, চন্দনকাষ্ঠে ভুলিলে চলিবে না। পুনরায় সে চলিতে লাগিল এবং চলিতে২ সম্মুখে এক তাম্রখনি দেখিতে পাইল। সেদিন যতদূর সাধ্য তাম্র লইয়া আসিল। পরদিন আবার তাহার স্মরণ হইল যে ঠাকুর মহাশয় তাম্রখনির কথা কিছু বলেন নাই কেবলমাত্র অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন, অতএব আবার সে চলিতে লাগিল এবং সেদিন এক রৌপ্যখনি দেখিতে পাইল। এইরূপে সে

প্রতিদিন অগ্রসর হইয়া সোণা হীরা প্রভৃতি নানা ধনে ধনী হইয়া পড়িল। ধর্ম্মরাজ্যেও ওই কথা, যদি ধনী হইতে চাও তবে অগ্রসর হইয়া যাও। সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায় তুষ্টি লাভ করিও না, ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিতে থাক, পরিণামে অমূল্য ধনে ধনী হইতে পারিবে।৪৯

সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র সমান হইলেও জলের ভিতর, আরসির ভিতর এবং সকলপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রকাশ সকল হৃদয়ে সমান হইলেও সাধু-দিগের হৃদয়ে অধিক পরিমাণে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।৫০

সাধুসঙ্গ ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ জানিবে।৫১

সকল পিষ্টকের এখোল এক তণ্ডুলচূর্ণে নির্ম্মিত কিন্তু পূর প্রভেদে পিষ্টক ভাল মন্দ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্য এক আধারে নির্ম্মিত বটে কিন্তু আত্মার পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ রূপে পরিগণিত হয়।৫২

বৃক্ষের প্রথম অবস্থায় বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয় নতুবা ছাগ গরু প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু বৃক্ষ একবার বড় হইলে আর সে ভয় থাকে না, শত২ গরু বাছুর আসিয়া তখন তাহার তলায় আশ্রয় লাভ ও তাহার পত্রে উদর পূর্ত্তি করিতে পারে। সাধনার প্রথমাবস্থায় আপনাকে সংসার, বিষয়বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে নতুবা সমুদায় ধর্ম্মভাব একেবারে বিনাশ পাইবে কিন্তু একবার সিদ্ধ হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না, শত-সহস্র সংসার আর তোমাকে সহজে বিনাশ করিতে পারিবে না।৫৩

সকল জল নারায়ণ বটে কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থলে ঈশ্বর বর্ত্তমান বটে কিন্তু সকল স্থলে যাওয়া উচিত নয়।৫৪

ব্যাঘ্রের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।৫৫

যে সকল লোক উপাসনা করিলে উপহাস করে, ধর্ম্ম ও

ধার্ম্মিকদের কুৎসা করে, সাধনার অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবে। ৫৬

জল ও দুগ্ধ একত্র রাখিলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যায়, দুগ্ধের বিভিন্নতা আর থাকে না। ধর্ম্মপিপাসু নবীন সাধক, সংসারে সকল-প্রকার লোকের সহিত মিলিলে, আপনার ধর্ম্মভাব হারাইয়া ফেলে, তাহার পূর্ব্বে বিশ্বাস, উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, সে কিছুই জানিতে পারে না। ৫৭

জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় বটে কিন্তু দুগ্ধকে মাখনে পরিণত করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শতসহস্র বদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও আর তোমার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না। ৫৮

স্প্রিংয়ের গদির উপর বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার সে পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ ধর্ম্মকথা যখন শুনে তখন ধর্ম্মভাব প্রবল হয় কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে ভাব থাকে না। ৫৯

যেমন কামারশালায় লৌহ যতক্ষণ হাপোরে থাকে ততক্ষণ লাল দেখায়। এবং হাপোর হইতে বাহির করিলেই কালো হইয়া যায় সেইরূপ সংসারী মানব যতক্ষণ ধর্ম্মমন্দিরে বা ধার্ম্মিকদিগের নিকট বসিয়া থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মভাবপূর্ণ থাকে এবং বাহিরে আসিলেই সে ভাব চলিয়া যায়। ৬০

গৃহস্থের বৌ নানাপ্রকার কার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকে কিন্তু সন্তান হইবার উপক্রম হইলে ক্রমে২ সে সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর তাহার আর অন্য কাজ-কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে না, সে সমস্ত দিন কেবল সেই সন্তানটিকে লালনপালন করে, এবং তাহার মুখচুম্বন করিয়া আনন্দিত হয়। মনুষ্যের আত্মা প্রথম অবস্থায় কার্য্য করিয়া আনন্দিত হয় এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্তির আশা করে কিন্তু আত্মা যখন ফলবতী হয় তখন আর তাহার কার্য্য দ্বারা সুখ লাভ হয় না। জ্ঞানচৈতন্যের

অভ্যুদয় হইলে মন আর কর্ম্মকাণ্ডে পড়িয়া থাকিতে পারে না তখন কেবলই আত্মাতে জ্ঞানানন্দ সম্ভোগ করিতে চায়। ৬১

গুরু বলিলেন, সকল পদার্থই ঈশ্বর। শিষ্য তাহাই বুঝিলেন। পথিমধ্যে একটি বৃহৎ হস্তী আসিতেছে। উপর হইতে মাহুত বলিতেছে, "সরিয়া যাও" "সরিয়া যাও"। শিষ্য ভাবিল, আমি কেন সরিব? আমি ঈশ্বর হস্তীও ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বরের নিকট ঈশ্বরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? সে সরিল না। অবশেষে হস্তী শুণ্ড দ্বারা তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। সে বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া গুরুর নিকট সবিশেষ জানাইল। গুরু বলিলেন, "ভাল বলিয়াছ, তুমিও ঈশ্বর, হস্তীও ঈশ্বর, কিন্তু উপর হইতে মাহুতরূপে আর একজন ঈশ্বর তোমাকে সাবধান হইতে বলিতেছিল, তুমি তাহার কথা শুনিলে না কেন?" ৬২

একদা এক সাধু পথিমধ্যে যাইতে যাইতে হঠাৎ এক দুষ্ট লোকের গাত্রে পা দিয়াছিল। সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সাধুকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিল। সাধু অচৈতন্য হইয়া ভূমে পড়িল। অবশেষে তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া নানামতে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ হইলে জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন দেখি মহাশয়, এক্ষণে আপনকার সেবা কে করিতেছে"? সাধু বলিলেন "যে আমায় মারিয়াছিল"। ৬৩

বৃক্ষস্থিত আম্র সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু একবার কাকে ঠুক্‌রাইলে আর তাহা কোন কার্য্যে লাগে না। দেবসেবায় আর সে আম্র প্রয়োগ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে না এবং আপনি ভক্ষণ করাও অবিধেয়। পবিত্রহৃদয় বালক ও যুবাদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতি আবশ্যক, কেন না একবার তাহাদের অন্তরে বিষয়বুদ্ধি প্রবেশ করিলে বা সয়তানে দংশন করিলে আর সে পথে লইয়া যাওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিবে। ৬৪

হাড়গিলা অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু তাহার মন শ্মশান ভাগাড় প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরবিহীন জ্ঞানীও অতি উচ্চ উচ্চ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করে কিন্তু তাহার মন অসার পৃথিবীর ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬৫

প্রশ্ন হইল—সমাধি অবস্থায় আপনার মনে কি ভাব হয়? বলিলেন "জীবন্ত মৎস্যকে পুষ্করিণী বা নদীতে ছাড়িয়া দিলে যে ভাব হয়"। ৬৬

প্রশ্ন হইল—গেরুয়া বসন পরিধানের আবশ্যকতা কি? বলিলেন "গেরুয়া বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। যেমন চটি জুতা ও ছিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক রাস্তা বেড়াইলে, সহজে মনে দীনভাবের উদয় হয়। পেণ্টুলেন ও বুট জুতা পায়ে দিলে সহজে মনে অহঙ্কারের ভাব উদয় হয় সেইরূপ গেরুয়া বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার উপযোগী ভাব উপস্থিত হয়। ৬৭

হস্তীর গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিলে সে তৎক্ষণাৎ অপরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু গাত্র পরিষ্কার করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিতে পারা যায় তবে আর তাহার গাত্র অপরিষ্কার হইবে না। সংসার মধ্যে যতই পবিত্রতা লাভ কর না কেন আবার অপবিত্র হইয়া পড়িবে কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার যে প্রকার মনের ভাব হইবে পরজন্মে তুমি সেই আকার ধারণ করিবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহার সৎ ভাবের উদয় হয় সে পরজীবনে উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।৬৮

কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে কুম্ভকার পুনরায় তাহাতে হাঁড়ি প্রস্তুত করে, কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙ্গিলে কুম্ভকার আর তাহাকে গ্রহণ করে না। অজ্ঞান অবস্থায় মরণ হইলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইয়া মরিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ৬৯

পরিপক্ক ফল আপনি ভূমিতে পড়িয়া যায় কিন্তু কাঁচা ফল পাড়িলে মিষ্ট লাগে না, পক্কের ন্যায় দেখায়ও না। জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ নিতান্ত আবশ্যক। ৭০

মানুষ আপনাকে চিনিলেই অপরকে ও পরমেশ্বরকে চিনিতে পারে। আমি কে? হস্ত পদ মস্তক মন আত্মা প্রভৃতির কোন্ অংশ "আমি"! ভালরূপ বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় "আমি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই। পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইলে

যেমন পিঁয়াজ বলিবার কোন পদার্থ থাকে না। "আমি"কে বিভাগ করিলে সেইরূপ "আমি" বলিবার কোন পদার্থ পাই না। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ঈশ্বর। আমিত্ব দূর হইলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। ৭১

মানুষ,—মান হুষ অর্থাৎ যাহার হুস আছে তাহাকেই মানুষ বলা যাইতে পারে। ৭২

মানুষ বালিসের খোল অর্থাৎ বালিসের খোল উপরে দেখিতে কোনটা লাল, কোনটা কালো, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই এক তুলা। মনুষ্য দেখিতে কেহ সুন্দর, কেহ কালো, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কিন্তু সকলকার মধ্যে সেই এক ঈশ্বর। ৭৩

এ সংসারে যেমন অনেকে বরফের বিষয় শুনিয়াছে মাত্র কখন চক্ষে দেখে নাই, ধর্ম্মপ্রচারকও সেইরূপ অনেকে আছেন যাঁহারা ঈশ্বরের তত্ত্ব শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছেন মাত্র জীবনে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই। আবার অনেকে যেমন বরফ দেখিয়াছে, ভক্ষণ করে নাই প্রচারকও সেইরূপ অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহার দূর আভাস মাত্র পাইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত তিনি যে কি পদার্থ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। বরফ-ভক্ষণকারীই বরফের গুণ বলিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত শান্ত দাস্য প্রভৃতি ভাবে যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই তাঁহার গুণ যথার্থ বলিতে সক্ষম। ৭৪

শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিষয় পাঠ করিয়া লোককে বুঝান আর মানচিত্রে কাশী দর্শন করিয়া লোককে কাশী বুঝান একই কথা। ৭৫

সকল জীব সমান হইলেও অবস্থাভেদে জীব চারিপ্রকার—বদ্ধ-জীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। ৭৬

বদ্ধজীব হরিনাম আপনিও শুনে না, পরকেও শুনিতে দেয় না, ধর্ম্ম সমাজ্ ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করিলে উপহাস করে। ৭৭

কুম্ভীরের গাত্রে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে, অস্ত্র উঠিয়া পড়িবে, তাহার গাত্রে কিছুই হইবে না। বদ্ধজীবদিগের নিকট ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন কিছুতেই তাহাদের প্রাণে লাগাইতে পারিবে না। ৭৮

পার্থিব লাভের আশায় বদ্ধজীবগণ অনেক প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু বিপদ দুঃখ দারিদ্র্য আসিলে, সে ধর্ম্মকর্ম্ম তাহাদের মনকে অধিকার করিতে পারে না। পক্ষী সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে কিন্তু বিড়ালে ধরিলে সে নাম ভুলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ৭৯

দশবার গীতা শব্দ উচ্চারণ করিলেই, গীতার অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—গী—তাগী—তাগী—তাগী—অর্থাৎ হে মানব সমুদায়, ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে মন অর্পণ কর। ৮০

[দ্বিতীয় ভাগ]

"এক জ্ঞানী ও এক প্রেমিক সাধক অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল। জ্ঞানী বলিলেন, আমাদের পলাইবার কোন কারণ নাই; সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; কিন্তু প্রেমিক সাধক বলিল— "না ভাই, চল আমরা পলাইয়া যাই, আমাদিগের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইতে পারে ভগবানকে কেন আর সে কার্য্যে অনর্থক পরিশ্রম করাইব।"(১)১

যখন অল্প বৃষ্টি হয় তখন জমির জল টুপ্ টুপ্ করিয়া পুকুরে গিয়া পড়ে কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে আর সে টুপ্ টুপ্ শব্দ থাকে না; তখন পুকুর, ডোবা একাকার হইয়া যায়। অল্প বিদ্যা বুদ্ধি বা ধর্ম্ম লাভ করিলে মনুষ্য বাহ্যাড়ম্বরে প্রবৃত হয় কিন্তু গভীরতা জন্মিলে আর সেরূপ করিতে পারে না।(২)২

(১) 'It is said that Mr. Moody in his early days was a regular attendant on the noonday prayer meetings, at one of these meetings a rich brother rose and told those present of an opportunity to do a certain good thing if only three or four hundred dollars could be raised for the purpose and asked them to pray earnestly that it might be done. In an instant Mr. Moody sprang to his feet and said 'Brother I would not trouble the Lord with a little thing like that, I would do it myself.'

(২) "যাহার অধিক গুণ সে আপনাকে ঢাকে; যে নির্গুণ সে আপনাকে ঢাক বাজাইয়া বেড়ায়। যাহার ভিতরে পদার্থ অল্প সে বাহিরে

যে মুসলমান আল্লা হো, আল্লা হো, করিয়া চীৎকার করিতেছে নিশ্চয় জানিও সে আল্লাকে পায় নাই, যে আল্লাকে পাইয়াছে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।(১) ৩

সন্ন্যাসী বলিলেন, কেহ কাহার নয়। ব্রাহ্মণ কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, যে স্ত্রী পুত্রের জন্য সে দিবানিশি খাটিয়া মরিতেছে সে স্ত্রী পুত্র যে তাহার কেহ নয় সে কিরূপেই বা বিশ্বাস করিবে—ব্রাহ্মণ বলিল "ঠাকুর, আমার সামান্য মাথা ধরিলে যে মাতা অস্থির হইয়া পড়ে, আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমাকে সুখে রাখিবার জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত যাহারা দিতে প্রস্তুত হয় তাহারা কি আমার কেহ নয়?" সন্ন্যাসী বলিলেন "যদি এরূপ হয় তাহা হইলে তাঁহারা তোমার আপনার বটে কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, তোমার মাতা তোমার স্ত্রী বা তোমার পুত্র তোমার জন্য আপনাদিগের প্রাণ দিতে পারে একথা কখন বিশ্বাস করিও না। সত্য মিথ্যা একদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিও—আজ বাটী যাইয়া তুমি মিছামিছি অসুস্থ হইয়া খুব চীৎকার করিও, বেদনায় অস্থির হইও। পরে আমি যাইয়া তোমায় রহস্য দেখাইব।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিল, কত ডাক্তার কত কবিরাজ আসিল কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণের বেদনা আর কমে না, তাহার মাতা হা হতোঽস্মি করিতেছে, তাহার স্ত্রী পুত্র সকলেই বিলাপ করিতেছে, এমন সময় সন্ন্যাসী যাইয়া উপস্থিত—সন্ন্যাসী বলিল "ইহার পীড়া অতি সাংঘাতিক, কোনমতে রক্ষা পাইবার উপায় দেখি না। তবে যদি ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ আপনার প্রাণ প্রদান করিতে পারে তবে এ যাত্রা রক্ষা পাইতে পারে। সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইল; সন্ন্যাসী তাহার বৃদ্ধা মাতাকে

অধিক আড়ম্বর করে এবং খুব বক্তৃতা করিয়া ধুমধাম করিয়া বেড়ায়। জগজ্জননীর অনন্ত শক্তি অনন্ত গুণ, কিন্তু দেখ তাঁহার এত লজ্জা যে তাঁহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইতেছে, কোটী কোটী লোক চীৎকাররবে স্তব স্তুতি করিতেছে; কিন্তু জননীর মুখে একটি কথা নাই, যেন তিনি বিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন।" —আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র।

(১) অষ্টাবক্র সংহিতা—

"প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে বাগ্মী ব্যক্তি মূক হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জড় হন"।—মুক্তি ও তাহার সাধন।

ডাকিয়া বলিল, "মা, এ বুড় বয়সে এমন উপযুক্ত সন্তান হারায়ে তোর বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান, তা তুই যদি এর পরিবর্ত্তে আপনার প্রাণ দিতে পারিস্ তা হলে আমি তোর ছেলেকে বাঁচাইয়া দিতে পারি, তুই মা হয়ে যদি আপনার সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে না পারিস্ তবে এ সংসারে উহার জন্য আর কে প্রাণ দিবে বল্?" বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাবা, ওর জন্যে তুমি আমায় যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। তবে প্রাণটা—তা এমন সন্তানের জন্য প্রাণ কোন্ ছার—তবে কি না এই ভাবি যে, আমি গেলে বাচ্ছা-কাচ্ছাগুলার কি দশা হবে? পোড়া কপাল আমার না হলে এ গর্ভে এগুলাকে কেন ধরিব বল?" এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, "বাবাগো মাগো, ওমা তোমাদের প্রাণে আবার দাগা দিয়ে কেমন করে যাবো গো।" সন্ন্যাসী বলিলেন "ইহার মাতা তো ইহার জন্য প্রাণ দিতে পারিল না, তা তুমি স্ত্রী, তুমি কি তোমার স্বামীর জীবন রক্ষা করিবে?" স্ত্রী বলিল "হত-ভাগিনী আমি, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক, অনর্থক মাতা পিতাকে আর কাঁদাইয়া কি লাভ হইবে?" এইরূপে সকলেই আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল; তখন সন্ন্যাসী রোগীকে বলিল, দেখিলে ত কেহই তোমার জন্য প্রাণ দিতে চায় না, অতএব নিশ্চয় জানিও এ সংসারে কেহ কাহার নয়।(১) ৪

কু-প্রবৃত্তির মধ্যে যখন আমার মন বাস করে তখন আমি হাড়ি-পাড়ায় বাস করি। ৫

যোগী সন্ন্যাসীরা সর্পের ন্যায়। সর্প নিজের জন্য কখন গর্ত্ত খনন করে না, ইন্দুরের গর্ত্তে থাকে, একটা গর্ত্ত ভাঙ্গিলে অপর একটি গর্ত্তে প্রবেশ করে। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেইরূপ নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে না, কিন্তু অপরের গৃহে, আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া দিন যাপন করে। ৬

প্রস্তর শত সহস্র বৎসর জলের মধ্যে থাকিলে তাহার ভিতরে জল কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না কিন্তু মৃত্তিকা জল সংযোগে

(১) চৈতন্য আলিঙ্গন দিয়া উঠাইয়া বলিলেন—"সনাতন, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণরত্ন অনেক দুঃখে মিলে। দেহ পুত্র দারা, বিষয়বাসনা এবং সমুদয় আশা ত্যাগ না করিলে সে ধন পাওয়া যায় না।"—রূপসনাতন।

তরল হইয়া পড়িবে। বিশ্বাসী হৃদয় শত সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলেও নিরাশ হইবে না কিন্তু অবিশ্বাসী সংসারী মানব সামান্য কারণে বিচলিত হইয়া পড়িবে। ৭

বালকের মন ষোল আনা নিজের নিকট থাকে; ক্রমে বিবাহ হইলে আট আনা স্ত্রীর প্রতি যায়, সন্তানে চারি আনা কাড়িয়া লয়, বাকি চারি আনা অহঙ্কার অর্থাৎ মানসম্ভ্রম বেশভূষায় কাড়িয়া লয়। অতএব বাল্যকালে যাহার ঈশ্বরে মতি হয় সে সহজেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ৮

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চতুর্দ্দিকে থাকে ততক্ষণ ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া শব্দ করে কিন্তু যেই ফুলের ভিতরে প্রবেশ করিল অমনি নিস্তব্ধে মধু পান করিতে আরম্ভ করিল। জ্ঞানী মানব! তুমিও এক্ষণে খুব চীৎকার করিতেছ জানি কিন্তু দেখিও বিন্দুমাত্র ভক্তি আস্বাদ পাইলে তুমিও মধুকরের ন্যায় সেই সুধা পানে মত্ত হইবে, আর চীৎকার করিবার অবসর পাইবে না।(১) ৯

বাল্যস্বভাব ব্যতীত টাকা মোহর ফেলে রাঙ্গা পুতুল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাসী হৃদয় ব্যতীত পার্থিব ধন মানকে তুচ্ছ করে, সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। ১০

অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চক্ষুর দুই দিক দিয়া বাহির হয়। নাসিকার দিকে চক্ষের যে কোণ সেখান দিয়া অনুতাপের অশ্রু এবং অপর দিক দিয়া আনন্দাশ্রু বাহির হয়। ১১

প্রশ্ন হইল, ঈশ্বর যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? বলিলেন, পানা দ্বারা আবৃত পুষ্করিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমরা বলিতেছ পুকুরে জল নাই। বাস্তবিক যদি জল দেখিতে চাও তবে পানা সরাইয়া ফেল। মায়া দ্বারা আবৃত চক্ষু লইয়া তোমরা বলিতেছ, ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না

---

(১) এক শিষ্য একদিন ঋষিকে বলিয়াছিলেন "ইহা অতি আশ্চর্য্য যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সে তাঁহাকে উপাসনা করে না।" ঋষি বলিলেন, তাহার সম্বন্ধে আমি আশ্চর্য্যান্বিত, যে তাঁহাকে জানে এবং তাঁহার উপাসনা করে অর্থাৎ ইহা আশ্চর্য্য যে কেহ তাঁহাকে জানিয়া মোহিত ও বিহ্বল না হইয়া সুস্থির ভাবে উপাসনা করিতে পারে।—তাপসমালা।

কেন? যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে মায়া-রূপ পানাকে হৃদয়-পুকুর হইতে উঠাইয়া ফেল।(১) ১২

ঐ যে জ্যোৎস্না রাত্রিতে গগনমণ্ডলে অসংখ্য তারকারাজি দেখিতেছ দিবসে সূর্যোদয়ে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না, তবে কি তুমি বলিবে যে দিবসে আকাশে তারাগণ থাকে না।(২) ১৩

দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মন কুকুরের ল্যাজের সমান। কুকুরের ল্যাজ হাজার টানিলেও সোজা করা যায় না, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মনও কিছুতেই পরিবর্ত্তিত করা যায় না। ১৪

জাহাজের কম্পাস উত্তর দিকে চাহিয়া থাকে, তাই জাহাজের দিক্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবনতরীর মন-রূপ কম্পাসও যদি সেই পরব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে তবে তাহাও নিরাপদ থাকিবে সন্দেহ নাই। ১৫

এ জগতে চারি প্রকার সিদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন-সিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ, দৈবসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ।

যেমন কোথাও কিছুই নাই হঠাৎ অনেক দরিদ্র বড়মানুষ হইয়া যায়, বিপুল অর্থের অধিকারী হয়, সেইরূপ অনেক পাপী মানব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে। লালা বাবু প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের লোক। ১৬

---

(১) পারস্য দেশীয় সাধক কবি খাজা হাফেজ বলিয়াছেন "সখার রূপের কোন আবরণ ও অবগুণ্ঠন নাই। তুমি পথের ধূলি নিবৃত্ত কর, তাহা হইলেই দর্শন করিতে পারিবে।"—মুক্তি ও তাহার সাধন।

(২) কবিবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন,

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে পদে গয়া গঙ্গা কাশী।—প্রসাদ প্রসঙ্গ।

দেঁতো অর্থাৎ বহির্দ্দন্ত বা গজদন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেঁতো ব্যক্তি না হাসিলেও যেমন দন্ত স্বতঃ প্রকাশিত থাকে, ঠিক সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করুক আর নাই করুক, করিতে পারুক আর নাই পারুক, তিনি (ব্রহ্ম) স্বতঃ প্রকাশিত রহিয়াছেন। যাহারা অন্ধ অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই তাহারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না নতুবা জ্ঞানীমাত্রেই তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দর্শন করিতে সমর্থ হয়।—মুক্তি ও তাহার সাধন।

যেমন অনেক বন কাটাইতে কাটাইতে, জলের কল, পুষ্করিণী বা অট্টালিকা পাওয়া যায়, কষ্ট করিয়া কাটাইতে বা নির্ম্মাণ করিতে হয় হয় না। সেইরূপ অনেক লোক সামান্য সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যায়। ১৭

নিত্য জীব লাউডগার সমান। লাউডগার আগে ফল, পরে ফুল হয়, নিত্য জীব আগে সিদ্ধ হইয়া পরে কর্ম্ম করে। ১৮

বানরের বাচ্ছা স্বীয় মাতাকে জড়াইয়া থাকে কিন্তু বিড়ালের ছানা ছল্‌ছল্‌ নেত্রে কেবল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। প্রথমটি নির্ভর, শেষটি প্রার্থনার ভাব। এই শেষ ভাবটি যথার্থ ভক্তের ভাব। ১৯

হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকগণ মাথার উপর চারি পাঁচটি জলপূর্ণ কলসী লইয়া যায়, পথিমধ্যে আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ করে, হাসে, কাঁদে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, কিন্তু মনে মনে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখে যেন তাহাদের মস্তকস্থ কলসী পড়িয়া না যায়। ধর্ম্ম-পথের পথিকগণকেও সকল অবস্থার ভিতরে ঐরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন তাঁহার পথ হইতে পড়িয়া না যান। ২০

পুষ্করিণী-জল দূর হইতে কালো দেখায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা কালো নহে—ঘন। কৃষ্ণও সেইরূপ কালো নহে—ঘন। ২১

তেলা হাতে কাঁটালের আঠা লাগে না, বিশ্বাসী হৃদয় পরীক্ষায় ভীত হয় না। ২২

মলয় পবন প্রবাহিত হইলে সারবান বৃক্ষসকল চন্দনকাষ্ঠে পরিণত হইয়া যায় কিন্তু তেঁতুল প্রভৃতি অসার বৃক্ষসকল যেমন তেমনই থাকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তিত হয় না। ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হইলে সারবান, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয় মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করিবার অনুকূল অবস্থা ও ভাব সকল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসার বিষয়াসক্ত মানব যেমন তেমনই থাকে। ২৩

সাধুসঙ্গ চালের জলের সমান, চালের জল নেশা কাটায়। যাহার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে তাহাকে চালের জল পান করাও দেখিবে

তাহার নেশা চলিয়া যাইবে। সংসারমদে মত্তজনার নেশা কাটাইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।(১) ২৪

খৈ ভাজিতে ভাজিতে দেখা যায়, যে খৈগুলা ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে, সেগুলা ফুলের ন্যায় সুন্দর ও সাদা; আর যেগুলা খোলার ভিতরে থাকে সেগুলা খৈ হয় বটে কিন্তু কোথাও না কোথাও ভাজার দাগ লাগে। সাধনা করিতে করিতে যাহারা সংসারের বাহিরে গিয়া পড়ে তাহারাই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, সংসারের ভিতরে থাকিয়া সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে কিন্তু কিছু না কিছু দাগ লাগিয়া থাকে। ২৫

পার্থিব মাতা যথা সময়ে আপন সন্তানকে ডাকিয়া খাওয়ায়, মা আনন্দময়ীও যথা সময়ে স্বর্গের সুধা খাওয়াইবার জন্য ডাকিতেছেন, হে মানব! চক্ষু খুলিয়া দেখ। ২৬

গ্যাসের আলো নানা স্থলে নানা ভাবে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদায়ই ভিতরে ভিতরে সেই এক আধার হইতে আসিতেছে। নানা দেশীয় ও জাতীয় বিভিন্ন বিভিন্ন উজ্জ্বল ধর্ম্মালোকও সেই এক পরমেশ্বর হইতে আসিতেছে।(২) ২৭

---

(১) অথর্ব্ব বেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে স্বর্গ ও নরকের সংক্ষেপে এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, যথা—

নরক কি?—অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক।

স্বর্গ কি?—সৎসঙ্গের নাম স্বর্গ।—মুক্তি ও তাহার সাধন।

(২) 'Sages name variously that which is but one.'—Rig Veda.

'As many men so many theologies but religion is one.'—Parker.

'Paradise is a central spot where the souls of all mankind arrive by different roads.'—Napolean I.

'Your religion is one, but ye have rent the affairs of your religion into various sects each delighting in that which he followeth.'—Koran.

'In every nation he that feareth Him and worketh righteousness is accepted with Him.'—Bible.

'যেমন একই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় তেমনি একই ধর্ম্মভাব ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।'—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

'আমি যেন দেখিতেছি, এ সমুদায় ভাব কাচের কলমে প্রতিফলিত

মফঃস্বলে নায়েব প্রজার প্রতি কত অত্যাচার করেন কিন্তু জমিদারের সন্নিধানে আসিয়া ধূমধাম করিয়া সকালে বৈকালে উপাসনা করেন, প্রজার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার নালিস উপস্থিত হইলে বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া সদ্বিচার করিতে চেষ্টা করেন। সঙ্গগুণে এবং জমিদারের ভয়ে অত্যাচারী নায়েবও ভাল হইয়া যায়। ২৮

নির্ভর কেমন? অত্যন্ত পরিশ্রমের পর তাকিয়া ঠেসান দিয়া তামাক টানা যেমন। ২৯

সাঁতার শিখিতে হইলে অনেক দিন জলে হাত পা ছুঁড়িতে হয়, একেবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না। ব্রহ্মজলধিতে সন্তরণ শিখিতে হইলেও আগে অনেকবার উঠিতে হয়, পড়িতে হয়, একেবারে হয় না। ৩০

যাত্রার দলে দেখিয়াছ, যতক্ষণ খোলে খচমচ খচমচ শব্দ করিতেছে, "কৃষ্ণ এস হে" "কৃষ্ণ এস হে" বলে চীৎকার করে গান করিতেছে, কৃষ্ণের তখন ভ্রূক্ষেপও নাই, সে আপন মনে সাজঘরে তামাক খাইতেছে, গল্প করিতেছে, কিন্তু যেই সকলে নিস্তব্ধ হইল—নারদ ঋষি মৃদুস্বরে—প্রেমভরে—গান ধরিলেন—কৃষ্ণ আর থাকিতে পারিল না, অমনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া আসোরে নামিয়া পড়িলেন। অন্তররাজ্যেও সেইরূপ জানিবে। যতক্ষণ উপাসক "প্রভু এস হে" বলে চীৎকার করিতেছে ততক্ষণ জানিও প্রভু সেখানে আসেন নাই। প্রভু যখন আসিবেন উপাসক তখন ভাবে গদগদ হইবে তখন আর চীৎকার করিতে পারিবেন না, এবং উপাসক যখন গদগদ-ভাবে ডাকিবে প্রভুও তখন বিলম্ব করিতে পারিবেন না। ৩১

অন্য জন্তু গরুর দলে প্রবেশ করিলে সকল গরু আসিয়া শিং দ্বারা তাহাকে তাড়না করিবে কিন্তু অপর একটি গরু প্রবেশ করিলে

সূর্য্যরশ্মিব ন্যায়। সূর্য্যরশ্মিতে নীল পীত লোহিত পাটল ধূমল প্রভৃতি সকল বর্ণেরই সমাবেশ। কিন্তু কাচখণ্ডে সেই রশ্মি যখন প্রতিফলিত হয় তখন এক দিক দিয়া দেখিলে নীল বর্ণ দেখিতে পাই আর এক দিক দিয়া দেখিলে পীত বর্ণ দেখিতে পাই।'—ঐ

সকলে আসিয়া তাহার গা চাটাচাটি করিবে। ভক্তের সহিত ভক্তের মিলনও এই প্রকার। ৩২

বদ্ধজীব পাষাণ সমান। পাষাণে যেমন পেরেক বসান যায় না, বদ্ধজীবকেও সেইরূপ ধর্ম্মকথা বুঝান যায় না। ৩৩

লবণের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে বা জলে নিক্ষেপ করিলে লবণের পুতুল একেবারে জলের সহিত মিলিয়া যায়, তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কাপড়ের পুতুলে জল প্রবেশ করে বটে কিন্তু তাহার স্বতন্ত্রতা যায় না বরং ইচ্ছা করিলে তাহাকে জল হইতে পৃথক করা যায়। পাথরের পুতুলের ভিতরে জল কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে না।

মুক্তজীব লবণের পুতুলের সমান।
সংসারী জীব কাপড়ের পুতুলের সমান।
আর বদ্ধজীব পাথরের পুতুলের সমান। ৩৪

আমার গুরু যদি শুঁড়িখানায় যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥ ৩৫

যে দ্রব্য লাভ করিতে চাও তদনুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা না করিলে কি হইবে? দুগ্ধে মাখম আছে বলিয়া চীৎকার করিলে কখন মাখম বাহির হইবে না। যদি মাখম বাহির করিতে চাও তবে দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত কর এবং পরে তাহা হইতে যথা নিয়মে মাখম বাহির কর। ৩৬

সিদ্ধ ধানের গাছ হয় না কিন্তু অসিদ্ধ ধানে হয়। জ্ঞান-চৈতন্য-বিশিষ্ট মানব মরিলে আর জন্মগ্রহণ করে না কিন্তু অজ্ঞানীকে পুনরায় জন্মাইতে হয়। ৩৭

পথে যাইতে যাইতে রাত্রি হওয়াতে এক মেছুনি এক মালীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, মালী যথাসাধ্য যত্ন করিয়া তাহাকে সেবা করিল, কিন্তু তাহার এত যত্ন ও আদর বৃথা হইতে লাগিল। মেছুনি কোন মতেই আর নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না, অনেক অনুসন্ধানের পরে সে বুঝিতে পারিল যে মালীর উদ্যানস্থ বিবিধ প্রকার পুষ্পের সৌগন্ধই তাহার ঘুমের ব্যাঘাত করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সে আপনার

মৎস্যের চুবড়িতে উত্তম রূপ জল ছিটাইয়া আপনার নাসিকার নিকট রাখিল এবং সুখে নিদ্রা গেল। বিষয়াসক্ত সংসারী মানব ঐ মেছুনির সমান, সংসারের দুর্গন্ধপূর্ণ কথা ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই ভাল লাগে না। ৩৮

যে সূতার কর্ম্ম করে সে সূতা দেখিলেই কোন্ সূতার কত নম্বর বলিয়া দিতে পারে। যদি সাধু চিনিতে চাও তবে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। ৩৯

ব্যাঙ্গাচির লেজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্গ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। আসক্তিগুলি কাটিয়া গেলেই ক্ষুদ্র মানুষ মুক্ত হয়। ৪০

মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে। ৪১

মনুষ্যের ভিতর দুইটা আমি কার্য্য করিতেছে, একটি পাকা আমি, অপরটি কাঁচা। ৪২

বড় বড় জাহাজ অনায়াসে ছোট ছোট জাহাজ সকলকে টানিয়া লইয়া যায়। মহাপুরুষগণও অনায়াসে সাধারণ নরনারীদিগকে ধর্ম্মের পথে টানিয়া আনেন। ৪৩

মাখম প্রস্তুত করিয়া জলের হাঁড়িতে রাখিলে তাহা ভাল থাকিবে কিন্তু দধির হাঁড়িতে রাখিলে তাহা ভ্যাস্ ভ্যাস্ করিবে। সংসার-আধারে ভাল জিনিস রাখিলে তাহাও ভাল থাকিবে না কিঞ্চিৎ খারাপ হইয়া যাইবে। ৪৪

সিদ্ধি সিদ্ধি বলিয়া চীৎকার করিলে সিদ্ধি খাওয়ার ন্যায় নেসা হইবে না। সিদ্ধি আনিয়া বাটো, খাও, তবে তোমার নেসা হইবে। অতএব চীৎকার করিলে কি হইবে? যে বস্তু লাভ করিতে চাও তদনুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হও, অবশ্য তাহা পাইবে। ৪৫

ঝড় উঠিলে অশ্বত্থ গাছ বট গাছ চেনা যায় না। জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে জাতিভেদ থাকে না। ৪৬

সূর্য্য, পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও দূরত্বের জন্য ক্ষুদ্র দেখায়। কৃষ্ণও সেইরূপ ১৪ পোয়া নহে দূরত্বের জন্য ঐ রূপ দেখায়। ৪৭

বেদ, তন্ত্র ও পুরাণ সমুদায় উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেন না

বার বার মনুষ্যকণ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু হরিনাম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই, কেন না কেহই অদ্যাবধি উহা উচ্চারণ করিতে পারে নাই। ৪৮

প্রশ্ন হইল, এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য তখন সাধু ভক্তেরা এ দেহের প্রতি যত্ন করেন কেন? বলিলেন, "শূন্য সিন্দুকের কেহ যত্ন করে না কিন্তু যে সিন্দুকে মোহর টাকা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য সকল থাকে সকলেই তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে।" যে হৃদয়-কুটীর পুণ্যাশ্রম হইয়াছে, যেখানে ভগবানের নিত্যলীলা প্রকাশিত হইতেছে, সাধু ভক্তগণ সেই হৃদয়াধার এই মলিন দেহকে যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ৪৯

কাষ্ঠ যতই পুড়িতে থাকে ততই তাহার ভিতর হইতে বিন্দু বিন্দু বারি নির্গত হয়। ব্রহ্মাগ্নিতে কঠিন মনুষ্যহৃদয় যতই প্রবেশ করে ততই তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়ে। ৫০

ভগবৎকৃপা হইলে মনুষ্য আপনি ধর্ম্মপথে আগমন করে, কাহাকেও ডাকিতে হয় না। পাপ বোধ হইলে মনুষ্য আপনিই দয়াল নামের স্মরণ লয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় নাঃ—

বালক—মা আমায় ডেকে হাগিও।

মাতা—আমায় ডাকিতে হবে না, তোমার বাহ্যেই তোমায় ডাকিবে এখন। ৫১

উচ্ছিষ্ট শালপাতা, যেমন ঝড়ে বহুদূর উড়ে যায়, ব্রহ্মকৃপায় সেইরূপ অক্ষম মানুষ সক্ষম হইয়া যায়। ৫২

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বেশ জলেতে ভাসিয়া যাইতেছে, যেই সামান্য ভার পড়িল অমনি সবসুদ্ধ ডুবিয়া গেল। কিন্তু বড় বড় কাঠ ভেসে যায়, দুচারি জন মানুষ তাহার উপরে বসিলেও অনায়াসে সবসুদ্ধ ভাসিয়া যায়, ডোবে না। মহাপুরুষগণ আপনাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে করিতে অন্য দশ জনেরও মঙ্গল সাধন করিতে পারেন কিন্তু সামান্য মানব সে চেষ্টা করিলে আপনিও নষ্ট হয় অপরকেও নষ্ট করে। ৫৩

গুটিপোকা যেমন আপনার নির্ম্মিত জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়, সংসারী মানবও সেইরূপ আপনার কল্পিত গৃহমধ্যে

আপনি আবদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। কেবল জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই ঐ ঘর কাটিয়া বাহিরে যায়। ৫৪

হাট হইতে যতক্ষণ দূরে থাকিবে ততক্ষণ কেবল হাটের হো হো শব্দ শুনিতে পাইবে, কিন্তু হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর সে শব্দ শুনিতে পাইবে না; তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইবে কেহ আলু চাহিতেছে, কেহ পটল চাহিতেছে। ঈশ্বর হইতে যত দিন দূরে অবস্থান করিবে তত দিন কেবল যুক্তি তর্ক ও মীমাংসার কোলাহল মধ্যে পড়িয়া থাকিবে কিন্তু তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারিলে আর তর্ক মীমাংসা থাকিবে না, তখন সকলই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। ৫৫

চৈতন্যের উদয় হইলে জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না। শরীরের কোন অংশে কাঁটা বিঁধিলে অন্য একটি কাঁটা দ্বারা সেই কাঁটাটি বাহির করিতে হয় এবং ঐ বিদ্ধ কণ্টক বাহির হইলে আর কোন কণ্টকেরও প্রয়োজন থাকে না। অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু চৈতন্যের উদয় হইলে আর জ্ঞানও থাকে না অজ্ঞানও থাকে না। ৫৬

প্রশ্ন হইল—মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা কিরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইব? বলিলেন,—যাহার গান বাজনার সখ থাকে সে তক্তা পিটিয়া বাজনা শিখে; মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে ব্যাকুলিত হয়, ভগবান তাঁহার নিকট আপনা হইতে সাধনপ্রণালী প্রকাশিত করেন। ৫৭

জ্ঞান—পুরুষ, ভক্তি—স্ত্রীলোক, ঈশ্বরের বহির্বাটীতে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে ভক্তি ভিন্ন আর কেহ যাইতে পারে না। ৫৮

শিশুসন্তানগণ একাকী ঘরের মধ্যে আনন্দে পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে, কোন ভয়ও নাই ভাবনাও নাই; কিন্তু যেই 'মা' আসিল অমনি পুতুল ফেলিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া নিকটে দৌড়িয়া গেল। মানবশিশুগণ! তোমরাও এক্ষণে ধন মান যশের পুতুল লইয়া বেশ আনন্দে খেলা করিতেছ, কোন ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যদি একবার সেই মাকে দেখিতে পাও তবে তোমাদিগকেও

ঐ সকল ফেলিয়া তাঁহার নিকট দৌড়াইতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখিলে আর সংসারের খেলা ভাল লাগিবে না।৫৯

কুলবধূগণ রজনীতে স্বামীর সহিত কি আলাপ করিয়াছে কাহাকেও বলে না, বলিতে ইচ্ছাও হয় না বরং কোনমতে প্রকাশিত হইলে লজ্জিত হয়, কিন্তু আপন সমবয়স্কবন্ধুদিগের নিকট সমুদায় প্রকাশ করে, প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হয় এবং বলিয়া আনন্দ পায়। ঈশ্বরের সাধকও কি ভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে প্রাণে যে ভাব হয় অপরের নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না, ব্যক্ত করিয়া সুখ পান না এবং ব্যক্ত করিতে গেলে প্রাণের সে ভাব থাকে না। কিন্তু অন্যান্য সাধক-দিগের নিকট প্রাণ খুলিয়া সে কথা বলেন, বলিয়া সুখ পান এবং বলিবার জন্য ব্যাকুলিত হন।৬০

চিদানন্দসাগরে ডুবিতে হইবে। যদি বল কাম-ক্রোধ-রূপ কুম্ভীর ধরিবে তবে বিবেক-বৈরাগ্য-রূপ হরিদ্রা মেখে ডুব দাও।৬১

প্রেম তিন প্রকার—

সামর্থ্যা,	সমঞ্জসা,	সাধারণী
উচ্চ	মধ্যম	নীচ

উচ্চ—তুমি ভাল থাকিলেই হইল, আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নাই।

মধ্যম—তুমি ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি।

নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাব? তুমি যেমন করে আমায় অমুক জিনিস দাও।৬২

মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে।
জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে॥ ৬৩*

শত্রুগণ যীশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন?

সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাঁস পর্য্যন্ত ভেদ

* ১ম সংস্করণের যে বইটি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এইখানে খণ্ডিত। ২য় সংস্করণ (১২৯৭) হইতে পরবর্ত্তী উক্তিগুলি মুদ্রিত করিলাম।

করে, কিন্তু খুড়ির নারিকেলের শাঁস ভিতরে আলগা হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাঁস ভেদ করে না। যীশু খ্রীষ্ট খুড়ির নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিঁধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই জন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্নভাবে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৬৪

যখন কোথাও যাইবে মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইবে; তাহা হইলে অনেক বিষয় যাহা করিবার কোন সংকল্প থাকে না, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; পুরুষার্থ সর্ব্বদা প্রয়োজন।* ৬৫

বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা কি ঠিক?

আত্মা উন্নত হইলে নারিকেল গাছের বাল্‌দের ন্যায় আপনিই পৈতে পড়ে যায়, তাহা ফেলিবার জন্য আর চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না। ৬৬

অন্নের ভাবনা ভাবতে হয়, সাধন করি কিরূপে?

যাঁর জন্য খাটবে তিনিই খেতে দিবেন, যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি আগেই খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ৬৭

তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা কি আবশ্যক?

তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পান। ৬৮

শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?

মানুষ হাড়ের ঘরকন্না করে, সেই দেহরূপ হাড়ের ঘরখানা কেবল পুঁজরক্ত মলমূত্রের আধার, এ সকল ভাবিলে তাহার প্রতি আর আসক্তি থাকে না। ৬৯

দৈবে পুরুষকারে চ, কার্য্যসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্রদৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্ব দৈহিকং॥

মনুষ্যের সমস্ত কর্ম্মই দৈব ও পুরুষকার দ্বারা সুসিদ্ধ হয়; পূর্ব্ব-জন্মার্জিত পাপ পুণ্যের প্রকাশমান ফলকে দৈব কহে; যে শক্তি দ্বারা পুরুষ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় তাহাকে পুরুষকার কহে। "পুরুষার্থ ছিল অর্জ্জুনের, যখনই যাহা করিবেন বলিয়া মনে করিতেন তখনই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।"

সাধকের কোনরূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?

ভেক ধারণ ভাল, গৈরিক পরিধান করিলে ও খোল করতাল লইলে মুখে খেয়াল টপ্‌পা আইসে না। কালাপেড়ে ধুতি প'রে, চুল বাঁকিয়ে, ছড়ি হাতে ক'রে বাহির হইলেই নিধুর টপ্‌পা গাইতে ইচ্ছা হয়। ৭০

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তার বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা। তোমার কোনকালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে। ৭১

এক একবার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন?

বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখতে হয়। সাধন চাই। ৭২

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট, তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন?

হাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন হরণ করেন। ৭৩

হরির আগমন কিরূপে হয়?

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়। হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়ীতে অগ্রে পাঠান, প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়ীতে গমনকালে পূর্ব্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। ৭৪

বিষয়লালসা কিরূপে দূর হয়?

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের আর বিষয়লালসা থাকে না। ৭৫

কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে?

ঝিকনে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব-নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের জাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়। ৭৬

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর-দর্শন হয়?

হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে দর্শন হয়। হৃদয়-সরোবর যখন কামনা-বায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব। ৭৭

ধর্ম্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছে না কেন?

সাঁকোর জল যেমন এক দিক দিয়া আইসে আর এক দিক দিয়া চলে যায়, অনেকের পক্ষে ধর্ম্মকথা তদ্রূপ, তাহারা এক কান দিয়া শোনে, তাহাদের অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। ৭৮

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরবক্ষস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি, সাগরেতেই তাহার স্থিতি। উভয় বস্তুতঃ এক; প্রভেদ এই যে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও আশ্রিত। ৭৯

ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙ্গা মুড় রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়। তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত সাধন চাই। ৮০

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপে চিকের ভিতরে যাইয়া তাঁকে দেখেন। ৮১

সকল মনুষ্যই কি ভগবানকে দেখিতে পাইবে?

কোন জীবই একেবারে উপবাসী থাকে না, তবে কিনা কেহ নয়টার সময়, কেহ দুইটার সময়, কেহ বা সন্ধ্যার সময় আহার করে। সেইরূপ সকলে কোন না কোন সময় ভগবানকে দেখিবে। ৮২

তত্ত্ব-প্রকাশিকা, ১-৩ খণ্ড ঃ রামচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত

ইং ১৮৮৬-৮৭। (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৪৯, ৪-সংখ্যক গ্রন্থ)

ঈশ্বর নিরূপণ

কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না। যেমন নিবিড় বনে দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তি-প্রস্তুতকর্ত্তা তথায় উপস্থিত নাই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার এই বিশ্ব-দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে জ্ঞাত হওয়া যায়।১

মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। রজনীযোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগনমণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে কিন্তু দিবা-ভাগে সেই তারকাবৃন্দ দৃষ্ট হইল না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না? ২

দুগ্ধে মাখম আছে। কিন্তু দুগ্ধ দেখিলে মাখম আছে কি না তাহা বালকের বুদ্ধির অতীত। বালক বুঝিতে পারিল না বলিয়া দুগ্ধকে মাখমবিবর্জ্জিত জ্ঞান করা উচিত নহে। যদ্যপি মাখম দেখিতে বা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কার্য্য চাই। দুগ্ধকে দধি করিতে হইবে, পরে তাহা হইতে মাখম প্রস্তুত করা যায়। তখন তাহা ভক্ষণে পুষ্টি লাভ করা যাইতে পারে।৩

সমুদ্রে অতলস্পর্শ জল। ইহাতে কি আছে এবং কি নাই তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নহে। মনুষ্যের দ্বারা তাহা স্থির হইল না বলিয়া কি সমুদ্রে কিছুই নাই বলিতে হইবে? যদ্যপি কেহ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করে তাহা হইলে সময়ে সময়ে কোন কোন মৎস্য কিম্বা জলজন্তু অথবা অন্যান্য পদার্থ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। নতুবা গৃহে বসিয়া সমুদ্রের বিচার করিলে কি ফল হইবে? ৪

লীলা অবলম্বন না করিলে নিত্য বস্তু জানিবার উপায় নাই।৫

কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে। একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ইহার কোন স্থানে আম্রের সার

কোথাও বা লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথানিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোথাও বা গোলাপ, বেল, জাতি, চম্পক প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্‌সমূহ সুবাসিত করিতেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণসুখ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথাও বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল অবস্থিতি করিতেছে ও স্থানে স্থানে নানাবিধ পুত্তলিকা সংস্থাপিত রহিয়াছে। দর্শক উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে? তাহার কি এমন মনে হইবে যে এই উদ্যান আপনি হইয়াছে? ইহার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই? তাহা কখন নহে। সেই প্রকার এই বিশ্বোদ্যানে যে স্থানে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাস্তবিক স্বভাব কর্ত্তৃক নহে, বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তের সৃজিত পদার্থ। ৬

এই বিশ্বোদ্যান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা এমন কি যোগী ঋষির পর্য্যন্ত মনাকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত? ৭

ঈশ্বর মন বুদ্ধির অতীত বস্তু এবং তিনি মন বুদ্ধিরই গোচর হইয়া থাকেন। যে স্থানে মন বুদ্ধির অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে তথায় বিষয়াত্মক এবং যে স্থানে উহাদের গোচর কহা যায়, তথায় বিষয়বিরহিত বলিয়া জানিতে হইবে। ৮

ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি?

ঈশ্বর এক। তাঁহার অনন্ত শক্তি। ৯

ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলে বহু হইয়া পড়ে। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা যায়? বর্ণ, দাহিকা-শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে অগ্নি বলে। কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নেয় বর্ণ, অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথবা অগ্নি এবং দাহিকা-শক্তি কিম্বা অগ্ন্যুত্তাপ, অগ্নি হইতে পৃথক নহে। অগ্নি বলিলে ঐ সকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি অভেদ। ১০

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; অচল, অটল, এবং সুমেরুবৎ। তাঁহার শক্তি দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। যেমন বৃক্ষের গুঁড়ি এক স্থানে অচলবৎ অবস্থিতি করে। কিন্তু শাখা প্রশাখা দিক্ ব্যাপিয়া থাকে।১১

শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।১২

অরণ্যে যখন কোন প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার সৌরভ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া সকলের নিকট সমাচার প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প স্বয়ং কোথাও গমন করে না কিন্তু তাহার সৌরভ-শক্তিই তাহার পরিচায়ক। সেইরূপ শক্তিই ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ করিয়া দেয়।১৩

যে শক্তি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে আদ্যাশক্তি বা ভগবতী কহে। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী তাঁহারই নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং চৈতন্যপ্রদায়িনী শক্তি জন্মিয়া থাকে। এক বৃক্ষের একটি ফুল হইতে একটি ফল উৎপন্ন হইল। তাহার কিয়দংশ কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অন্যান্য আকারে পরিণত হইয়া যাইল। যেমন বেল। ইহার বহির্য্যাবরক বা খোসা আভ্যন্তরিক কোমলাংশ বা শাঁস এবং বিচি ও সূত্রবৎ গঠনগুলি এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সেই প্রকার চৈতন্যশক্তি হইতে জড়ের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।১৪

ঈশ্বরের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার

ব্রহ্মের দুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা সাক্ষী স্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদবাচ্য। আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়।১৫

ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা কি অর্থাৎ বাস্তবিক গুণবিবর্জ্জিত কিম্বা সকল গুণের আকর তিনি, তাহা মনুষ্যেরা কিরূপে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে? তিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ব্রহ্মও যে বস্তু, ঈশ্বরও সেই বস্তু। যেমন আমিই এক সময়ে দিগম্বর আবার আমিই আর এক সময়ে স্বাম্বর।১৬

১০টি জলপূর্ণ মৃৎপাত্র অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত হইলে সূর্য্যোদয়ে উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইবে। তখন বোধ হইবে যে দশটি সূর্য্য প্রবেশ করিয়াছে। যদ্যপি একটি একটি করিয়া সমুদয় পাত্রগুলি ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? তখন সূর্য্যও নাই অথবা পাত্র এবং জলও নাই। ১৭

ব্রহ্মের, সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্ত অবস্থাও আছে। ১৮

যেমন ঘণ্টার ধ্বনি। প্রথমে যে শব্দ হয় তাহাকে ঢং বলে, পরে সেই শব্দ যেরূপে ক্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যে পর্য্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে সাকার কহে। বাক্যের অতীত কিন্তু উপলব্ধির অধিকার পর্য্যন্ত নিরাকার, তাহার পরের অবস্থা বাক্য এবং উপলব্ধির অতীত, ইহাকে তৃতীয়াবস্থা কহা যায়। ১৯

ওঁকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় সাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তদ্‌পরে সাকার নিরাকারের অতীতাবস্থা। ২০

সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল। ২১

যেমন বরফ এবং জল। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ অবস্থা। একটি কঠিন আকার বিশিষ্ট এবং অপরটি তরল ও আকারবিহীন। জলের এই পরিবর্ত্তন উত্তাপ এবং তাহার অভাব হিম-শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের, জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যূনাধিক্যে ব্রহ্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে। ২২

ব্রহ্মের সাকার রূপ জড়পদার্থ সম্ভূত অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিকা কিম্বা কোন প্রকার ধাতুবিনির্ম্মিত নহে। তাঁহার রূপ যে কি এবং কি পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাহা বচনাতীত। সে পদার্থ জড়জগতে নাই যে তাহার দ্বারা উল্লেখিত হইবে। জ্যোতি ঘন বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু সে যে কি প্রকার জ্যোতি তাহা চন্দ্র, সূর্য্যের জ্যোতির সহিত তুলনা হইতে পারে না। ফলে তাঁহার রূপ অনুপমেয় এবং বচনাতীত। যদ্যপি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার তুলনা তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিতে হয়। ২৩

এই সাকার মূর্ত্তি যে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরাধীন তাহা নহে। সাধক ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গস্পর্শনাদি করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪

আদি শক্তি হইতে সাকার রূপের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব, নৃসিংহ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে তৎসমুদয় সেই আদি শক্তির গর্ভ-সম্ভূত। এই জন্য সকল দেবতাকে এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন এক চিনির রস হইতে নানাবিধ মট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা এক মৃত্তিকাকে জালা, কল্‌সি, ভাঁড়, খুরি, প্রদীপ, হাঁড়ি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যায়। ইহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে কাহারও সহিত কাহার সাদৃশ্য নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু উপাদান-কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ২৫

ঈশ্বর এক, তাঁহার অনন্ত রূপ। যেমন বহুরূপী গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে কোন সময়ে হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পাইল, কেহ বা নীলাভাযুক্ত, সময়ান্তরে কেহ লোহিতবর্ণ এবং কেহ কখন তাহা সম্পূর্ণ বর্ণ-বিবর্জ্জিত দেখিল। এক্ষণে সকলে মিলিয়া যদ্যপি গিরগিটীর রূপের কথা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? স্থূলে সকলে স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যদ্যপি তাহা পার্থক্য জ্ঞানে অবিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস করা হইল। কিন্তু কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায়? স্থূল দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির হইতে পারে না। এই জন্য গিরগিটীর নিকটে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমুদায় বর্ণ ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটীর বিভিন্ন বর্ণ তাহা বোধ হইয়া থাকে।

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে হয়। যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কত প্রকার পদার্থ আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ২৬

সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার। দ্বিতীয়াবস্থায় সাকার রূপ দর্শন, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার হয়। ২৭

কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত সাকার মূর্ত্তি নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক আতা দেখিয়া সোলার আতা সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা জড় মূর্ত্তির উপাসনা করে তাহারা বাস্তবিক জড়োপাসক নহে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জড় নহে। যদ্যপি প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহার তাহাই লাভ হইবে কিন্তু ঈশ্বরভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই হইয়া থাকে। ২৮

সাধক যখন সাকার রূপ দর্শন করেন তখন তাহার নিত্যাবস্থা হয়। জড় পদার্থে আর মনাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নহে। সুতরাং তাহাকে পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয়। এ সময়ে তাহার নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে। ২৯

যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহার সেই স্বভাবানুযায়ী ঈশ্বর সাধন করা কর্ত্তব্য। ৩০

সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ৩১

এই গুণত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক গুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন সত্ত্বের সহিত রজ মিশ্রিত হইলে সত্ত্ব-রজ; রজ তম সংযোগে রজ-তম এবং সত্ত্ব তম দ্বারা সত্ত্ব-তম ইত্যাদি। ৩২

যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্ম-গরিমা প্রকাশ না পায়, সর্ব্বদাই দয়া দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়; রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে; আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে; স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ত্ব-গুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। ৩৩

রজ গুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে। কোন কোন রিপুর পূর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে। ৩৪

তম গুণে রজর সমুদয় লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় এবং তদ্ব্যতীত রিপুগণেরও পূর্ণ কার্য্য হইয়া থাকে। ৩৫

যে ব্যক্তির যে গুণ প্রধান, তাহার তদ্রূপই কার্য্য হইয়া থাকে।

এই গুণভেদের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যের সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত সাধনকার্য্যে এক প্রণালী মতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা যায় না। ৩৬

যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যে রূপে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে তাহার ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে। ৩৭

মত পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ গাড়ীতে এবং কেহ হাঁটিয়া আসিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে তাহা সকলেরই এক। ৩৮

মুক্তিদাতা এক জন। সংসারক্ষেত্রে যাহার যখন বিরাগ জন্মে অন্তর্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারেন এবং তিনি সেই সাধকের ইচ্ছা বিশেষে ব্যবস্থা করিয়া দেন। ৩৯

কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন। ৪০

অন্য অন্য যুগে অন্য প্রকার সাধনের নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধ হওয়া যায় না কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প তাহাতে ম্যালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে লোকে জীর্ণ শীর্ণ, কঠোর তপস্যা কেমন করিয়া করিবে! এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত। ৪১

ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে নামে বিশ্বাস এবং সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। এই সাধন-পথ অবলম্বন ব্যতীত কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব নহে। ৪২

বিচার দুই প্রকার—অনুলোম এবং বিলোম। যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ। ইহাকে বিলোম এবং মাঝ হইতে খোল ইহাকে অনুলোম কহে। যেমন বেল। ইহা খোশা, শাঁস, বিচি, আঠা এবং শিরার সমষ্টি এই বিচারকে বিলোম বলে। অনুলোম দ্বারা উহাদের এক সত্ত্বায় উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ৪৩

শিয়ালদহে গ্যাসের মসলার ঘর। কোন জায়গায় পরি, কোথাও মানুষ, কোথাও লাণ্ঠান, কোথাও ঝাড়; কত রকমে গ্যাসের আলো

জবলিতেছে, গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে কেউ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। যে কেউ স্থূল আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে সে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই অদ্বিতীয় ঘর বলিয়া জানিবে। ৪৪

সদসৎ বিচারকেই বিবেক বলে। বিবেক হইলে বৈরাগ্যের কার্য্য আপনি হইয়া যায়। বৈরাগ্য সাধনের স্বতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসী হওয়া যারপরনাই কঠিন কথা। বৈরাগ্য হইলে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কলিকালে কামিনী ত্যাগ করা যায় না। হয়ত অনেক কষ্টে কামিনী ত্যাগ হইতে পারে। কিন্তু অপর দিক হইতে কাঞ্চন আসিয়া আক্রমণ করে। যদ্যপি কামিনী পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের দাস হইতে হয় তাহা হইলে তাহার বৈরাগ্য সাধন হয় না। যদিও এক্ষেত্রে এক দিকে বৈরাগ্য হইল কিন্তু তাহাতে আরও অপকারের সম্ভাবনা। কামিনীত্যাগী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কারের এত দূর প্রাবল্য হয় যে, যে অহং বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য তাহারই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার দ্বারা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং কামিনী কাঞ্চন সংলিপ্ত মূঢ় বিষয়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ৪৫

সন্ন্যাসী-ত্যাগী হইলে অর্থোপার্জ্জন কিম্বা কামিনী সহবাস করা দূরে থাক যদ্যপি হাজার বৎসর সন্ন্যাসের পর স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেত পতন হইয়া যায় অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে তাহা হইলে এত দিনের সাধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

সন্ন্যাসীর কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসে দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়াছিলেন এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৪৬

সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী অর্থেই ত্যাগী, তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান নহে। ৪৭

দুই প্রকার সাধক আছে। বাঁদরের ছানার স্বভাব এবং বিড়াল-ছানার স্বভাব। বাঁদরছানা জানে যে তার মাতাকে না ধরিলে সে কখন স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না। কিন্তু বিড়ালছানার সে বুদ্ধি নাই।

সে নিশ্চয় জানে যে তার মাতার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে রাখিবে সে কেবল ম্যাও ম্যাও করিতে জানে। সন্ন্যাসী সাধক বা কর্ম্মীদিগের স্বভাব বাঁদরছানার ন্যায়। অর্থাৎ আপনি খাটিয়া খুটিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা জ্ঞানে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বিড়ালছানার ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে।৪৮

জ্ঞান এবং ভক্তি এই পথ লইয়া সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা বলে যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হয় না এবং ভক্তিমতে তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান পুরুষ। সে বহির্বাটীর খপর বলিতে পারে এবং ভক্তি স্ত্রীলোক সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত জ্ঞানপথে যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয় তাহা সম্পূর্ণ স্থূল ও বাহিরের কথা। ভক্তদিগের মতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।৪৯

জ্ঞান অর্থে জানা এবং বিজ্ঞান অর্থে বিশেষরূপে জানা। এই বিজ্ঞানের পর অর্থাৎ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধকের মনের ভাব যেরূপে প্রকাশিত হয় সেই কার্য্যকে ভক্তি বলে। ইহাকে শুদ্ধ-জ্ঞানও কহা যায়।৫০

ভক্তেরা যখন যেরূপ দর্শন করেন তাহা তাঁহাদের চরম নহে। কারণ সে অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন এবং অনাহারে থাকিলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা ভগবানের নিয়ম। যাঁহারা ভগবানের রূপ লইয়া অবিচ্ছেদে কাল হরণ করিতে চাহেন তাঁহার একুশ দিনের অধিক দেহ থাকিতে পারে না। দেহান্ত হইয়া যাইলে তাঁহার যে কি অবস্থা হয় তাহা কাহার বলিয়া দিবার শক্তি নাই। দেহবিচারে জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধি হওয়া এবং ভক্তের এই অবস্থা একই প্রকার।৫১

গৃহস্থেরা একটা বড় মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিল। কেহ ঐ মৎস্যের ঝোল, ভাজা, তেলহলুদে, চড়চড়ী, পোড়া, ভাতে, অম্বলে ভক্ষণ করিল। এস্থলে মৎস্য এক কিন্তু ভাবের কত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।৫২

এক ব্যক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার জ্যেঠা, কাহার মামা, কাহার মেশ, কাহার পিসে, কাহার ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক অদ্বিতীয় কিন্তু তাহার ভাবে অসীম প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে। ৫৩

যেমন জল এক পদার্থ। দেশভেদে কালভেদে এবং পাত্রভেদে নামান্তর হয়। যেমন বাঙ্গালায় বারি, নীর বলে, সংস্কৃতে অপ বলে, হিন্দিতে পাণি বলে, ইংরেজীতে ওয়াটার ও একোয়া বলে। কাহার কথা না জানিলে কেহ বুঝিতে পারে না কিন্তু জানিলে কিম্বা না জানিলে ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত নাম (হরি, ব্রহ্ম, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, আল্লা, গড, জিহোবা, জোভ, লর্ড, ইত্যাদি) এবং অনন্ত ভাব (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি)। যাহার যে নামে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রহ্মের রাজ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না অথবা কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ৫৪

যে তাঁহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে তিনি তাহার অতি নিকট হইয়া থাকেন। ৫৫

যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তিনি তাহার সদ্‌গুরু সংযোজন করিয়া দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই। ৫৬

বকলমা অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই। ৫৭

একটি পক্ষী কোন জাহাজের মাস্তুলে বসিয়া থাকিত, চতুর্দ্দিকে জল, উড়িয়া যাইবার স্থান ছিল না। পক্ষী মনে মনে বিচার করিল যে, আমি এই মাস্তুলকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান করিয়া বসিয়া আছি হয়ত কিঞ্চিৎ দূরে অরণ্য থাকিতে পারে। এই স্থির করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। সে যেদিকে ধাবিত হইল সেই দিকে অনন্ত জলরাশির কোথাও কূল কিনারা পাইল না। যখন চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন সেই মাস্তুলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় লইল। সেই দিন হইতে মাস্তুল সম্বন্ধে অদ্বিতীয় বোধ স্থির হইয়া

নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত ভাব জ্ঞাত না হইলে তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা যায় না। এই জন্য সাধনের সময় বিচার আবশ্যক।৫৮

নাম অবলম্বন করিলে বিচার করিতে হয় না। নামের গুণে সকল সন্দেহ কুতর্ক দূর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, এবং নামে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু নামে বিশ্বাস করিতে হইবে।৫৯

যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া থাকিলে করতালি দ্বারা তাহাদের উড়াইয়া দেওয়া যায় তেমনি নামসঙ্কীর্ত্তন কালে করতালি দিয়া নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে পাপ-পক্ষীরা পলাইয়া যায়।৬০

ধ্যান করবে বনে, মনে এবং কোণে।৬১

যাহারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে চাহে তাহারা কোন প্রকারে কামিনী কাঞ্চনের সংস্রব রাখিবে না। তাহা না করিলে কস্মিন্ কালে কাহারও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই।৬২

যাহারা একবার ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদন করিয়াছে তাহাদের যাহাতে আর সে ভাবের উদ্দীপন না হইতে পারে এমন সাবধানে বাস করা কর্ত্তব্য। কারণ চক্ষে দেখিলে এবং কর্ণে শুনিলে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনে একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গেলে তাহা তাহার চিরজীবনে ভুল হয় না। একদা একটি দামড়া গরুকে আর একটি গরুর উপর ঝাঁপিতে দেখিয়া তাহার কারণ বাহির করায় জানা গেল যে উহাকে যখন দামড়া করা হয় তৎপূর্ব্বে তাহার সংসর্গ জ্ঞান জন্মিয়াছিল।৬৩

যেমন দুর্গমধ্যে থাকিয়া প্রবল শত্রুর সহিত অল্প সেনা দ্বারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায়, তাহাতে বলক্ষয় হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে না এবং পূর্ব্বসংগৃহীত ভোজ্য পদার্থের সাহায্যে অনাহার-জনিত ক্লেশ অথবা তাহা পুনরায় সংগ্রহ করিবার আশু চিন্তা করিতে হয় না, সেই প্রকার সংসারে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে।৬৪

নির্লিপ্ত ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।৬৫

যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া

থাকে। সন্তানদিগকে লালন পালন করে। তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে কিন্তু মনে জানে যে তাহারা কেহই নহে। ৬৬

যখন কেহ কোন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যায় তখন তাহাকে তাহার পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। যাহার কেহ না থাকে অর্থাৎ সকল বন্ধন পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা হয়। ৬৭

সংসারে সকলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং তজ্জন্য সকলের নিকটেই ঋণী থাকিতে হয়। এই ঋণ-মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। উপায়হীন পিতা মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ হয় না এবং তাঁহারা সঙ্গতিপন্ন কিম্বা অন্যান্য পুত্র কন্যা থাকিলেও তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত দুইটি পুত্র না জন্মে সে পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঋণ বলবতী থাকে। সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সন্তানের ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিলে ঋণমুক্তির বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে। ৬৮

মনই সকল কার্য্যের কর্ত্তা। জ্ঞানী বল অজ্ঞানী বল সকলই মনের অবস্থা। মনুষ্যেরা মনেই বদ্ধ এবং মনেই মুক্ত; মনেই অসাধু, এবং মনেই সাধু, মনেই পাপী এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে পারিলে পূর্ণ সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের আর অপেক্ষা রাখে না। ৬৯

যেমন সমুদ্রে জাহাজ পতিত হইলে জল-হিল্লোলের গত্যনুসারে তাহা পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু তন্মধ্যস্থ কাম্পাসের উত্তর-দক্ষিণমুখী সূচিকা আপন দিক কখন পরিভ্রষ্ট হয় না। ৭০

যে জীব সংসারে থাকিয়া মনে মনে একবার হরি বলিয়া স্মরণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে শূর বা বীর ভক্ত বলেন। ৭১

যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদয় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে,

তাহার প্রতি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৭২

অনেকে বলে যে একটা মন কেমন করিয়া সংসার এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ করিবে? ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে। ৭৩

কোন স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হইলে সে গৃহের যাবতীয় কার্য্য করিয়াও অনবরত তাহার উপপতিকে হৃদয়ে চিন্তা এবং ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ। ৭৪

অবস্থাসঙ্গত কার্য্য না করিলে তাহাকে পরিণামে ক্লেশ পাইতে হয়। ৭৫

যাহার এখানে আছে তাহার সেখানে আছে। যাহার এখানে নাই তাহার সেখানে নাই।

পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) এবং সংক্ষিপ্ত জীবনঃ

গিরিশচন্দ্র সেন-প্রকাশিত। (জানুয়ারি ১৮৮৭। দ্রষ্টব্যঃ

পৃ. ১৪৯-৫১, ৫-সংখ্যক গ্রন্থ)

[এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ উক্তি-সংখ্যা ৭৫, তন্মধ্যে ১-৩০ বর্ত্তমান পুস্তকের ৪০-৪৫ পৃষ্ঠায় এবং ৬৫-৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাকি ৮টি নিম্নে দিয়া এই গ্রন্থের উক্তি-সংগ্রহ সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইল।]

ঈশ্বর কি ভাবে দেখা দেন?

বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছ দেখা যায় না' ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ দুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায়, পরে বড়শিবিদ্ধ হয়। তদ্রূপ ভগবান্ ঘনসচ্চিদানন্দ গূঢ়ভাবে থাকেন, যোগ ধ্যান প্রেমভক্তির চার দিতে দিতে কখন কখন দৈবাৎ তিনি আসিয়া দেখা দেন। তৎপর ধরা দিয়া থাকেন।

বিষয়লালসা কিরূপে দূর হয়?

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন তাঁহাদের আর বিষয়লালসা থাকে না।

স্বামীর সম্বন্ধে সতী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রী কিরূপ?

সতী স্ত্রী বিদ্যার শক্তি। তিনি আপন স্বামীকে বিষয়সুখের জন্য লালায়িত দেখিলে সাবধান করিয়া বলেন, "ছি ছি জঘন্য বিষয়-সুখ অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর।" মন্দ স্ত্রী অবিদ্যার শক্তি, সে ভগবদ্ভক্ত পতিকেও সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে।

কি প্রকার লোক অন্য লোকের নেতা হইতে পারে?

যে গরুর মস্তকে গোরোচনা থাকে সে দলের অন্য অন্য গরুর অগ্রে অগ্রে গমন করে। সেইরূপ যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে তিনিই অপর সকলের নেতা হন।

ব্রহ্ম নির্ব্বিকার হইলে তাঁহার লীলা কিরূপে সম্ভব?

বৃক্ষের ছায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বৃক্ষের মূলদেশ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। সেইরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না, অথচ তাঁহার লীলা পরিবর্ত্তনশীল।

সঙ্গীত কি ভাবে করিতে হয়?

হস্তীর দুই প্রকার দন্ত, এক প্রকার দেখাইবার জন্য, অন্য প্রকার আহারাদি করিবার জন্য, সেইরূপ সঙ্গীতাদিও দুই প্রকার, এক প্রকার সঙ্গীত লোককে শুনাইবার জন্য, অন্য প্রকার ভোগ করিবার জন্য।

সকল মনুষ্যই কি ভগবান্‌কে দেখিতে পাইবে?

কোন জীবই একেবারে উপবাসী থাকে না, তবে কি না কেহ নয়টার সময়, কেহ দুইটার সময়, কেহ বা সন্ধ্যার সময় আহার করে। সেইরূপ সকলে কোন না কোন সময় ভগবানকে দেখিবে।

স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্র ভাব কিরূপে রক্ষা করা যায়?

লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনী প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হয়। যিনি পৃথিবীর সৃজন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহে না। প্রায় সকলেই বাগান ও পরির মূর্ত্তি দেখে ভুলে যায়। যাঁহার বাগান ও পরির মূর্ত্তি তাঁহাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে চায়। স্ত্রীলোকেরাই

পরি, তাহারা মোহিনী মায়া। মেয়ে আর মায়া এক। অবিদ্যারূপ মেয়ে কালসাপের ন্যায় পুরুষের চৈতন্য হরণ করে। কিন্তু যাহারা প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতে পান তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক মেয়ে জগজ্জননীর প্রেরিতা।

[নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বাদে এই গ্রন্থের জীবনী-অংশও আমরা বর্ত্তমান পুস্তকমধ্যে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি; ৫৪ পৃষ্ঠায় "আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংস" হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৫ পৃষ্ঠায় "সার মাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন"—এর পরে এই অংশটি বসিবে।]

পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। তিনি যেসকল পদার্থকে দৃষ্টান্তস্থল করিতেন সেইগুলি এক একবার তাঁহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইত; সেই মহৎ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় ষ্টীমারে চড়িবার সাধ প্রকাশ করেন। ১৮০৩ শক ১লা শ্রাবণ শুক্রবার আমাদের আচার্য্যদেব কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস দেবকে তুলিয়া লন। পরমহংস দেব ষ্টীমারের ঝক্‌ঝক্ শব্দ শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে কোন বন্ধু জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিতে বলিলেন। তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন, "আমার মন এইক্ষণ ঈশ্বরে বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি কি বল এইক্ষণ আমি তাঁহা হইতে উঠাইয়া লইয়া এই দূরবীক্ষণে বদ্ধ করিব?"

[ইহার পরে গ্রন্থে আমাদের পুস্তকের ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত "১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ" হইতে "শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন।" অংশ সন্নিবিষ্ট আছে এবং এইখানেই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। আমরা পুস্তকমধ্যে ও পরিশিষ্টে গিরিশচন্দ্র সেনের সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই পুনর্মুদ্রিত করিলাম।]

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

My mind is still floating in the luminous atmosphere which that wonderful man diffuses around him whenever and wherever he goes. My mind is not yet disenchanted of the mysterious and indefinable pathos which he pours into it whenever he meets me. What is there common between him and me? I, a Europeanised, civilised, self-centered, semi-sceptical so-called educated reasoner, and he, a poor, illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee? Why should I sit long hours to attend to him, I who have listened to Disraeli and Fawcett, Stanley and Max Muller, and a whole host of European scholars and divines? I who am an ardent disciple and follower of Christ, a friend and admirer of liberal-minded Christian missionaries and preachers, a devoted adherent and worker of the rationalistic Brahma-Samaj—why should I be spell-bound to hear him? And it is not I only, but dozens like me who do the same. He has been interviewed and examined by many, crowds pour in to visit and talk with him. Some of our clever intellectual fools have found nothing in him, some of the contemptuous Christian missionaries would call him an impostor, or a self-deluded enthusiast. I have weighed their objections well, and what I write now I write deliberately.

The Hindu Saint is a man much under forty. He is a Brahmin by caste, he is well-formed naturally, but the dreadful austerities through which his character has developed have permanently disordered his system, and inflicted a debility, paleness, and shrunkeness upon his form and features that excite the deepest compassion. Yet, in the midst of this emaciation, his face

retains a fulness, a child-like tenderness, a profound *visible humbleness, an unspeakable* sweetness of expression and smile that I have seen in no other face that I can remember. A Hindu saint is always particular about his externals. He wears the *Garua* cloth, eats according to strict forms and is a rigid observer of caste. He is always proud and professes secret wisdom. He is always *guruji,* and a dispenser of charms. This man is singullarly indifferent to these matters. His dress and diet don't differ from those of other men except in the general negligence he manifests towards both, and as to caste, he openly breaks it every day. He most vehemently repudiates the title of being called a teacher or *guru,* he shows impatient displeasure at any exceptional honor which people try to pay to him, and he emphatically disclaims the knowledge of secrets and mysteries. He protests against being lionised, and openly shows his strong dislike to be visited and praised by the curious. The society of the worldly-minded and the carnally-inclined he shuns carefully. He has nothing extraordinary about him. His religion is his only recommendation. And what is his religion? It is Hinduism, but, Hinduism of a strange type. Ramkrishna Paramhansa (for that is the saint's name) is the worshipper of no particular Hindu God. He is not a Shivaite, he is not Shakta, he is not a Vaishnava, he is not a Vedantist. Yet he is *all these.* He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna, and is a confirmed advocate of Vedantist doctrines. He is an idolater and is yet a faithful and most devoted mediator of the perfections of the one, formless, infinite Deity whom he terms '*Akhanda Sachchidananda.*' His religion, unlike the religion of ordinary Hindu *Sadhus,* does not mean the maturity of doctrinal belief, or controversial proficiency, or the outward worship with flower and sandal, incense and offering. His religion means ecstasy, his worship means transcendental perception, his whole nature

burns day and night with the permanent fire and fever of a strange faith and feeling. His conversation is a ceaseless breaking forth of this inward fire, and lasts long hours. While his interlocutors are weary, he, though outwardly feeble, is as fresh as ever. He merges into rapturous ecstasy and outward unconsciousness often during the day, oftenest in conversation when he speaks of his favourite spiritual experiences, or hears any striking response to them. But how is it possible that he has such a fervent regard for all the Hindu deities together? What is the secret of his singular eclecticism? To him each of these deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless Being Who is unchangeable in His blessedness and the Light of Wisdom....

Each form of worship which we have tried to indicate above is to the Paramhansa a living and most enthusiastic principle of personal religion, and the accounts of discipline and exercise through which he has arrived at his present state of devotional eclecticism are most wonderful, though they cannot be published. He never writes anything, seldom argues, he never attempts to instruct, he is continually pouring his soul out in a rhapsody of spiritual utterances, he sings wonderfully and makes observations of singular wisdom. He unconsciously throws a flood of marvellous light upon the obscurest corners of the Puranic Shasters, and brings out the fundamental principles of the popular Hindu faith and notions with a philosophical clearness which strangely contrasts itself with his simple and illiterate life. These incarnations, he says, are but the forces (*Shakti*) and dispensations (*Lila*) of the eternally wise and blessed (*Akhanada Sachchidananda*) who never can be changed or formulated, who is one endless and everlasting ocean of light, truth and joy. When this singular man is with us, he would sometimes say the incarnations forsook him, his mother the *Vidya-Shakti*

Kali, stood at a distance, Krishna could not be realized by him either as *Gopal* the child, or as *Swami* the Lord of the heart, and neither Rama, nor Mahadeo would offer him much help. The *Nirakar Brahma* would swallow everything, and he would be lost in speechless devotion and rapture. If all his utterances could be recorded they would form a volume of strange and wonderful wisdom. If all his observations on men and things could be reproduced, people might think that the days of prophecy, of primeval, unlearned wisdom have returned. But it is most difficult to render his sayings into English. We here try to give some stray bits :

[এইগুলি বর্ত্তমান পুস্তকের ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

A living evidence of the sweetness and depth of Hindu religion is this holy and good man. He has wholly controlled and nearly killed his flesh. He is full of soul, full of the reality of religion, full of joy, full of blessed purity. As a sidhha Hindu ascetic he is a witness of the falsehood and emptiness of the world. His witness appeals to the profoundest heart of every Hindu. He has no other thought, no other occupation, no other relation, no other friend in his humble life than his God. That God is more than sufficient for him. His spotless holiness, his deep unspeakable blessedness, his unstudied endless wisdom, his childlike peacefulness and affection towards all men, his consuming, all-absorbing love for his God are his only reward. And may he long continue to enjoy that reward ! We cannot be like him. We must not be like him. Our ideal of religious life is different, but so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God ! (The *Theistic Quarterly Review*, October-December 1879, pp. 32-39.)

Both in Keshub's Life and Teachings and in the old *Theistic Review,* I have frankly and warmly expressed

my estimate of that saintly man and our obligations to him.... and I would not withdraw a single word I wrote in his praise. Ramakrishna was not in the least a Vedantist, except that every Hindu unconsciously imbibes from the atmosphere around some amount of Vedantism, which is the philosophical backbone of every national cult. He did not know a word of Sanskrit, and it is doubtful whether he knew enough Bengali. His spiritual wisdom was the result of genius and practical observation.—Letter to Max Muller, September 1895 (Quoted in *Ramakrishna His Life and Sayings*, pp. 61-62)

সি. এইচ. টনী

Whatever may be thought of the culture of the Saint Ramkrishna it is impossible to read his sayings without conceiving a genuine respect for him. But the paramount importance of the work* seems to us to consist in the fact that it contains the idea of a teacher who has profoundly influenced his educated fellow countrymen. (C. H. Tawney : "A Modern Hindu Saint," Jany. 1896)

ম্যাক্সমূলার

...though the real presence of the Divine in nature and in the human soul was nowhere felt so strongly and so universally as in India, and though the fervent love of God, nay the sense of complete absorption in the Godhead, has nowhere found a stronger and more eloquent expression than in the utterances of Ramakrishna, yet he perfectly knew the barriers that separate divine and human nature. (Max Muller : *Ramakrishna : His Life and Sayings*, Preface 1898)

* 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি': সুরেশচন্দ্র দত্ত-প্রকাশিত।

উইলিয়ম ডিগ্‌বি

During the last century the finest fruit of British intellectual eminence was, probably, to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they are mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ramakrishna of Bengal, who knowing naught of what we term 'learning,' spake as not other man of his age spoke, and revealed God to weary mortals. (W. Digby : *'Prosperous British India'*, 1901, p. 99).

শ্রীঅরবিন্দ

The world could not bear a second birth like that of Ramakrishna Paramahamsa in five hundred years. The mass of thought that he has left, has first to be transformed into experience; the spiritual energy given forth has to be converted into achievement. Until this is done, what right have we to ask for more? What could we do with more?

Religion always, in India, precedes national awakenings. Sankaracharya was the beginning of a wave that swept round the whole country, culminating in Chaitanya in Bengal, the Sikh Gurus in the Punjab, Sivaji in Maharastra, and Ramanuja and Madhavacharya in the South. Through each of these, a people sprang into self-realisation, into national energy, and consciousness of their own unity. Sri Ramakrishna represents a synthesis, in one person, of all the leaders. It follows that the movements of his age will unify and organise the more provincial and fragmentary movements of the past.

Ramkrishna Paramahamsa is the epitome of the whole. His was the great super-conscious life which alone can witness to the infinitude of the current that bears us all ocean-wards. He is the proof of the Power behind us, and the future before us. So great a birth

initiates great happenings. Many are to be tried as by fire, and not a few will be found to be pure gold; but whatever happens, whether victory or defeat, speedy fulfilment or prolonged struggle, the fact that he has been born and lived here in our midst, in the sight and memory of men now living is proof that

God hath sounded forth the trumpet
That shall never call retreat!
He is sifting out the hearts of men
Before His judgment seat;
Oh, be swift my soul, to answer Him;
Be jubilant, my feet!
While God is marching on!

[*Karmayogin*, 19th March 1910]

The passage you have quoted [from *Synthesis of Yoga*] is my considered estimate of Sri Ramakrishna.

"Nor would a successive practice of each of the yogas in turn be easy in the short span of our human life and with our limited energies, to say nothing of the waste of labour implied in so cumbrous a process. Sometimes, indeed, Hathayoga and Rajayoga are thus successively practised. And in a recent unique example, in the life of Sri Ramakrishna Paramahamsa, we see a colossal spiritual capacity first divine straight to the Divine realisation, taking as it were the kingdom of heaven by violence and then seizing upon one yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge." 3rd February 1932. (Quoted in Dilip Kumar Roy's *Among the Great*, p. 303)

মহাত্মা গান্ধী

The story of Ramakrishna Paramahamsa's life is a story of religion in practice. His life enables us to see God face to face. No one can read the story of his life without being convinced that God alone is real and that all else is an illusion. Ramakrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned man but they are pages from the Book of Life. They are revelations of his own experiences. They therefore leave on the reader an impression which he cannot resist. In this age of scepticism Ramakrishna presents an example of a bright and living faith which gives solace to thousands of men and women who would otherwise have remained without spiritual light. Ramakrishna's life was an object-lesson in Ahimsa. His love knew no limits geographical or otherwise. May his divine love be an inspiration to all.... (Foreword : *Life of Sri Ramakrishna,* Nov. 1924)

রমাঁ রলাঁ

To my Western Readers

I am bringing to Europe, as yet unaware of it, the fruit of a new autumn, a new message of the Soul, the symphony of India, bearing the name of Ramakrishna. It can be shown (and we shall not fail to point out) that this symphony, like those of our classical masters, is built up of a hundred different musical elements emanating from the past. But the sovereign personality concentrating in himself the diversity of these elements and fashioning them, into a royal harmony, is always the one who gives his name to the work, though it contains within itself the labour of generations. And with his victorious sign he marks a new era.

The man whose image I here evoke was the consum-

mation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. Although he has been dead forty years, his soul animates modern India. He was no hero of action like Gandhi, no genius in art or thought like Goethe or Tagore. He was a little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident, outside the political and social activities of his time. But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods. It was a part of the very source of Energy, the Divine Shakti, of whom Vidyapati the old poet of Mithila, and Ramprasad of Bengal sing.

Very few go back to the source. The little peasant of Bengal by listening to the message of his heart found his way to the inner Sea. And there he was wedded to it, thus bearing out the words of the Upanishads:

"I am more ancient than the radiant Gods. I am the first born of the Being. I am the artery of Immortality."

It is my desire to bring the sound of the beating of that artery to the ears of fever-stricken Europe, which has murdered sleep. I wish to wet its lips with the blood of Immortality. (Romain Rolland: *The Life of Ramakrishna,* 1928, pp. 14-15)

রবীন্দ্রনাথ

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

('উদ্বোধন,' ফাল্গুন ১৩৪২)

To the Paramhansa Ramkrishna Deva
Diverse courses of worship
from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the Infinite
has given form to a shrine of unity in your life
where from far and near arrive salutations
to which I join mine own.

(*Prabuddha Bharat,* Feb. 1936)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণের মত মানুষ যে এখনও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ভারতবর্ষ যে নিকৃষ্ট দেশ নহে এবং ভারতীয়েরা যে নিকৃষ্ট জাতি নহে, তাহার অন্যতম প্রমাণ। পুস্তকলব্ধ বিদ্যা যাঁহার ছিল না এরূপ একজন মানুষ যে-দেশে জন্মিয়া তাঁহার মত সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার মত জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গের উপদেশ দিতে পারেন, সে-দেশ সামান্য নয়। সেই দেশের অধিবাসী জাতিও সামান্য নয়। সামান্য হইলে সে-দেশের মানসিক ও আত্মিক পরিবেষ্টনে এরূপ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। ('প্রবাসী,' ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ. ৭২৬)

সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

While the sayings of Ramakrishna did not penetrate so much into academic circles, they found their way into lonely hearts who have been stranded in their pursuit of pleasure and selfish desires. Under the inspiration of this great teacher there has been a powerful revival of social compassion....He has helped to raise from the dust the fallen standard of Hinduism, not in words merely, but in works also. (*The Cultural Heritage of India,* March 1937. Vol I, Introduction, p. xxx)